উৎসর্গ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য

তিনি আমায়

তিনি আমায় রথ সাজাতে বলেছিলেন জুঁইফুলে
আমি দিয়েছিলাম কনকচাঁপা তার বহুক্ষণ গন্ধ থাকে
তাঁর নরম হাতটা ধরতেই সেটা গলে গেল
তিনি এত শুভ, প্রিয়, এত স্পর্শাতুর···
আমার ক্ষোভ ছিল না, চোখের নীচে কালি পড়ে নি
চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখে আমার ছায়াকে
আর একবার তাকাতেই ছায়া সরে গেল মিলিয়ে গেলেন তিনি···
সারা বিকেল রথ সাজালাম তাঁরই জন্যে
তিনি কী নিলেন কিংবা কী পেলেন···
আসলে তি'ন কি ছিলেন নাকি শুধু আমি-আমি খেলা
যখন প্রতিটি লোক একা হয়ে যায় কোন একদিন ?

সদর দরজায়

আমি সদর দরজায় বসে থাকি
যার অদূরেই হাজার হাজার পাখি উড়ে যায়
উড়ে যায় ভোর পাঁচটায়
যখন বধ্যভূমির ঘাতক কিছুক্ষণ অস্ত্র ফেলে রেখে একান্তে ঘুমোয়
ঐ বিমানের শব্দে ছিন্নভিন্ন স্বপ্ন, স্মৃতি, জীবন-কৌতুক, খেলা, হেলাফেলা
পৃথিবীর সশব্দ চুম্বন, উদ্ধত গ্রীবার ভঙ্গি, অহংকার প্রতি পদক্ষেপে
দূর শূন্যে হা-হা হাসি, পড়ে থাকে পার্থিব রোদন
সদর দরজায় বসলে সবই শোনা যায়
শোনা না গেলেও ঢের বেশি বোঝা যায়
কেন না সদর দরজার পথ চলে গেছে
দূরে উড়ে যাযবীর শূন্যতায় শুধু হাহাকারে ।

একবার ডাক দিলেই

একবার ডাক দিলেই দুবার প্রতিধ্বনি হবে
কাছে পিঠে বিস্তর পাহাড়
শুধু ঝরণাগুলো শুকিয়ে গেছে
কবে কে পিছলেছিল এই পাথরেই
কবে কে ভেসে গিয়েছিল জলে যখন সত্যিই জল ছিল
ঈষদুষ্ণ থেকে উষ্ণ উষ্ণতর দিনগুলি এসে শুষে নিয়েছিল কবে ঐ নীল জল
আমার কিন্তু দেখা হয় নি ধরা হয় নি কার প্রতিধ্বনি
বর্ষায় জল জমার জন্যে প্রতীক্ষা করেছি
কখন মেঘ নয় মেঘ হয় গাছগাছালির ঐ পারে।

জানলা খুলে দাও

একটি জানলা খুলে দিয়ে কতগুলি জানলার আলো এনেছো সকালে,
এই ত সকাল হল, মধ্যরাত্রির চাঁদ কোন স্বপ্নের ভিতরে বাসা বেঁধে গেছে
আমি সেই ভেজা উচ্চতায় গাল রেখে পৃথিবীর শব্দ শুনতে চাই
পৃথিবী অনেকদিন ফার্লো নিয়ে বাড়ি গেছে
পৃথিবী সচিবালয়ে রেখে গেছে আমাদের কাগজপত্রের মধ্যে
আলমারির পাল্লা খুললে ন্যাপথলিন সজ্জার ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসছে পৃথিবীর মানুষদের ভাললাগা মন্দলাগা
তুমি যার মধ্যে মিশে আছো
আমার পুত্র কি পত্রপুষ্প—আমি জানলায় কতকাল
তুমি দরজার একপাশে
দরজার বন্ধন অনায়াস
যার একবার ছিন্নবাধা অতি সহজেই সে-ই গড়ে তুলতে পারে
সেই গড়ে ঘর যে জানে কোথায় দরজা, জানলা কোনখানে
যে জানে কোথায় বাধা নেই—হাওয়া আর জ্যোৎস্না আসে
যে জানে হঠাৎ হঠাৎ হাসি হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় ডালটাল সব
পৃথিবীর শব্দ শুনে সে পারে সহজে বিছোতে সহজ কার্পেট।

মুঠো খুলে যায়

মুঠো খুলতে না খুলতে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ঝড় এলো
মুঠোর ভেতর রোদ ছিল শ্রাবণের মাসে
সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যেমন বকুল পড়ে থাকে
মধ্যে মধ্যে কুচো পাতা
হুস করে ট্রেনের ঝাপটানি
পড়ো-পড়ো যাত্রীর পাদানি
সব খসখস শব্দ করতে করতে উড়ে যায়
যেন কে ট্রামের থেকে এক ঝলক পড়ন্ত বেলায়
জু-স্পেশ্যাল থেকে ফেরা
অথবা, উত্তর কলকাতার ঠিক কলকাত্তাই ধরণ
কাপড়ের দোকানে দোকানে, কষ্টিগোধে
ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজামহারাজা
যাদের ফিটন চড়ার শব্দ ট্র্যাফিক জ্যামের তলায় কতদিন
সমস্ত মুঠোর মধ্যে ছিল
আমাদের ইতিহাস সমস্ত সুন্দর জিনিস মুঠোতেই রাখা যায়
আংটির ভেতর দিয়ে চলে যায় মসলিন কাপড়
আমরা বিবস্ত্র হওয়ার কালে মরণোন্মুখ সময়ে
দেখি, হাতের ভেতর থেকে প্রিয় নস্যাড়িবেখানি গড়িয়ে যায়, গড়িয়ে যায়
মুঠো আপনি খুলে পড়ে।

ছোট বৌ পাখি

পৃথিবীর কোন পাখি উড়ে উড়ে ছোট-বৌ হয়
পাতার আড়ালে বসে থাকে
সে পাখি কি বুলবুলি টুনটুনি টিয়া
লাল ঠোঁট লাল চোখ সবুজ গায়ের খনরোম
কোন নদী পাহাড় পেরিয়ে

শিস্ শুনে ছুটে আসে
গলা শুনে চিনে নেয় বছর বছর কেটে গেলে
বৌ-কথা-কও পাখি ভোরবেলা দ্বার খুলে দিলে
ছোট-বৌ তখনো ঘুমায়
সে পাখি কি বুলবুলি টুনটুনি টিয়া
সে পাখি কি আমার মনিয়া !

মুখ না দেখলে

মুখ না দেখলে কথা বলা যায় না, বৃথা টেলিফোন
মুখ মানে দাঁত, ঠোঁট, মাথানাড়া, হাসি এবং বিষাদ
অতএব দিনমান চাই, হোক সে দুপুর কিংবা রক্তাভ বিকেল
কেন না তখন চোখের চাহনি দেখা যায়, দেখা যায় ভ্রূকুটি কেমন
যদি পৃথিবীই চাও যদি প্রকৃতিই চাও তবে দিনমান চাই
রাত্রি শুধু সমাজের অন্ধকার জমা করে রাখে, রাত্রি নৈঃশব্দ্যের
মুখের সামনে মুখ রেখে আমি পৃথিবীকে দেখতে চাই
যে-মুখের অর্ধচন্দ্র অর্ধচন্দ্রে মিশে দিনের বেলায় আনে পূর্ণচাঁদ
সে-চাঁদের আগুনে জানি সবই ঝলসায়।

অভিমান

যেন কিছুই হয় নি সব ঠিকঠাক আছে
কোথাও ভ্রূকুটি নেই কপালে কি চোখের তলায়
সমস্ত কথায় আতিশয্য ঝরে পড়ে হাসিতে খুশিতে
যেমন বড়ো একটা বৃষ্টির পরে স্থলপদ্মের ডাল দুলতে থাকে
মনে হয় না সকালের গোলাপী রক্তিম হয়ে উঠবে বিকেলবেলায়
সব কিছুই বরং সাগ্রহে এগিয়ে দেওয়া টুকিটাকি এটাসেটা

ভিতরে কার্নেশ কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না
নিজেরই ভেতরটা শুধু পুড়ে যাচ্ছে
বোঝা যায় না ওপরে কিছুই কপট অগ্নিশিখা ছাড়া।

কোথায় সীমানা

আর একবার হাওয়া চাই সারাদিন
বুকের ফুসফুস দুটো ফাঁকা ফাঁপা সহজ হয়ে উঠুক
রাস্তার লালফুলগুলো এক পশলা বৃষ্টিতে এখন ঝরঝরে পরিষ্কার হয়ে যাক
হাঁটুজল বাঁচিয়ে আমরা পায়রা-ছাদের নীচে দাঁড়াই
তোমার হাতের কঙ্কণে গাল রাখতে ইচ্ছে করে
সুন্দর গলার গভীরতায় ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়
দিন ফুরোবার আগে এখনো দিনের হাওয়ায়
তোমার ওড়া-চুলের উত্তাল ভাবার ভিতরে
আমার শুধুই বোবা দৃষ্টি।

যা হাওয়ায় লুটোয়

একদিক হাওয়ায় লুটোচ্ছিল আর একদিক হাসির ভিতরে
হাতঘড়ির মুখ চেয়ে সময় ছুটছে
এত অহংকারী হৃদয়, সাদা আংটির কুন্দ কিংবা যূথী একরাশ কুয়াশা ছড়ালো…
মনে হয় রাত্রি আর নেই অথচ রাত্রিই শুধু আছে
বাইরে খুচরো যাত্রী, যান, নদীপারাপার, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার
কত সহজেই তার মধ্যে তীর ছোঁড়া যায়
কেউ জানবে না দেখবে না কোথায় কখন হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল
শুধু একদিন হাতঘড়ি এগিয়ে দেবে হাত ক্যালেণ্ডারটাকে
ক্যালেণ্ডার যাবে পঞ্জিকায়
তারপর মাস, বছর, যুগ এবং বিস্মৃতি
ধপ্পটপ্প হাওয়ায় লুটোবে।

তেইশ-চব্বিশ

তেইশ কিংবা চব্বিশ নিয়ে লোকালুকি খেলি মাস কিংবা বছর
সাধ্যমত ভাবার দোপাটি অন্ধকারে কে ফোটাবে আর
ঐ সবই ধুয়ে ভেসে যাবে
ঐ সবই ধুয়ে থেকে যাবে
আমি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠলে পরে
তেইশ বত্রিশ হয়ে যাবে
অন্ধকারে ভাবার দোপাটি অন্ধকারেই মিলোবে।

আমায় ভাবতে দিন

দাঁড়ান, বাইরে দাঁড়ান, ভেতরে আমায় ভাবতে দিন
ভাবতে দিন অনেক বছর যে ভাবনার কোন শেষ নেই
বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে দোলনচাঁপার কৌচে দুলতে দুলতে
ঘুমে ঢলে পড়া এক মুহূর্তের ভিতরে…
বাইরে জাল জমে গেছে সে সব কি কেটে ফেলা যায়
দাঁড়ান, বাইরে থেকে দেখুন ভিতরে
দেখুন কাচগুলোয় নাকি ছানিও পড়েছে
আমাদের ভাবনার ওপর ছানি পড়ছে
আমাদের ভাবনায় ঘানি ঘুরছে, ঘুরছে
কিছুই বেরোচ্ছে না কিন্তু, শুধুই ভাবনা
আপনারা বাইরে থাকুন, দাঁড়ান বাইরে !

আমি পারি নি

আমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেয়েছিলাম, পারি নি
অন্ধকারে পা ঘষটে ঘষটে

টেনে টেনে জুতোর কাঁকর থেকে পা তুলেই
সারা পৃথিবীর সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবে গেল
ধাক্কা দিতে চেয়েছিলাম এই ধাপ্পা যুগটাকেই
আমার কপালে শিরা ফুলে উঠেছিল
রোমকূপে খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছিল হঠাৎ প্রহরী
কিন্তু কিছুই পারছিলাম না
ততদিনে তলে তলে বয়ে গেছে জল
ততদিনে বুড়ো ইতিহাস পাতাগুলি ফরফর ফরফর শব্দ করে খুলে
ফেলেছিল
ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে গিয়ে নিজেরই মুঠোর রক্তর
চারিদিক পাথর হয়েছে দেখলাম।

কবে ট্রেন ছেড়েছিল

কেন জানলা বন্ধ রাখি
সোনার শেকল পরা পাখি
থরে থরে সোনার পাহাড় সিন্দুকে এখন হীরামোতি
পাখিদের ডানা-কাটা সময় এখন
যারা চিনতো তারা সব নাম ভুলে গেছে
শেষ দেখা ভোরের প্ল্যাটফর্মে যখন একঘন্টা কোন মেলগাড়ি
চা-পানের অবসরে ইঞ্জিন বদলাতে চেয়েছিল
তুমি জীবন আমার পাথেয় দিয়েছিলে, দিয়েছিলে কয়েকটি বছর
সেই সব অপব্যবহারে নিঃশেষিত
অন্ধকারে সোনার শেকল বাজে
মনে পড়ে
কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে কবে ট্রেন ছেড়েছিল।

সেই একদিন চাই

সেই একদিন কবে হবে
কবে ঠিক জানলা খুলে আকাশ
        এবং আকাশ ভাবলেই পাখির দল ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়
নীচে গোলাপবাগানে প্রিয় মহিষী রাণীর জুতোর ছাপ
বিকেলে গোলাপগুচ্ছ তাঁরই চাই
সেই একদিন চাই বলে চৌকিদার ঢ্যাঁড়া পিটেছিল
যেন বা রসুনচৌকি বসেছিল, ভুরভুর সুগন্ধ ইতিহাস
এইসব ভাবতে ভাবতে সিঁথির রূপালি
        অন্য রং নেই বলে এবারেও রূপালি থেকে গেল
হয়ত সেদিন ঠিকই আসছে, জানতে পারি নাকো
হয়ত সেদিন কোন মেঘের আড়ালে আড়ালে কাঠ-পা চুলকোয়
হাই তোলে আড়ামোড়া ভাঙে
এবং আমরা ঠিক পাশটাশ ফিরতে না ফিরতেই
চোখের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়
আসলে আমরা নাকি চিরকালই ঘুমিয়ে রয়েছি।

কেমন লাগছে

কেমন লাগছে জীবন
ভাল নয়
কেমন লাগছে জীবন
মন্দ নয়
কেমন লাগছে জীবন
ভাল নয় মন্দ নয় ভালমন্দ কিছু নয়
যেমন গড়িয়ে চলে পা
যেমন ঝুলতে থাকে হাত বাসেট্রামে
যেমন প্রেমের মুখ চোখে পড়লে আর উনিশবিশ কিছুই হয় না

সকলেরই প্রায় সেরকম
ভাবতে ভাল লাগে তোমারও জীবন তেমন
তোমাতে আমাতে শুধু এইখানে জীবনে জীবন।

আমরা সকলেই

এপাশ থেকে ওপাশ অব্দি দড়ি বেঁধেছি
তাতে সবাই কাপড় মেলেছে
ভ্রূরে কাপড়টা হাওয়ায় হাওয়ায় নারিকেল পাতার চিরুণি
মাথার ভেতর দিয়ে আঙুল নাচায়
আমরা সকলকেই চিনি এ ওকে ও তাকে, নামধাম না জানলেও চিনি
কেন না একইভাবে দরজায় ছিটকিনি সকলেই দেয় রাত্রি হলে
একইভাবে জল আর নুন প্রত্যেকের লাগে প্রতিটি সকালে ··
'উঠে আয়' বললাম ওকে 'চোখের কাজল কেউ মুখে মাখে
মুছে ফেল ঐ কালো মুখ
যখন বুকের মধ্যে হু হু করবে, দে তোর খুঁটেই চোখ মুছি
আয় হাত ধর
আমরা সকলেই ছাখ্ সকলকেই জানি'।

আশা, আশালতার জু একদিন

আমি আশা করে আছি কিছু হবে, আশালতা ফিরবে একদিন
আমার জানলার পর্দা খুবই রঙিন হয়ে যাবে
বাগানের ওপাশ থেকে দুবেলা আকাশ খুব নিচু হয়ে এসে
সুখের ভালমন্দের মধ্যে আমাকে গভীরভাবে কাছে ডেকে নেবে
তোমরা যারা সৌম্য হয়ে গেছো, ফিরে এসো
তোমরা যারা দূরে চলে গেছো, ফিরে এসো

আমরা ভারতবর্ষের চেনা নদীটির হাত ধরে ধরে
চলে যাব পাহাড় পেরিয়ে
চলে যাব সমতলে শস্যক্ষেত্র জাঁতাকল সমস্ত ছাড়িয়ে
আশালতা যেখানে এখন।

মন ছুটি চায়

তোমরা সবাই কেন ছুটি চাও মেঘ, আকাশ, মৌসুমি বাতাস
কত অপরাহ্নবেলা খেলার মাঠের ওপর দিয়ে গিয়েছে গড়িয়ে
হ্রদজলে পা ভিজিয়ে হাতে দিয়ে কত হাততালি
যে যার হৃদয় থেকে অনাবশ্যকের ভিড় করে গেছে খালি
বাড়িফেরা বক যেমন মাঝে মাঝে সন্ধ্যার অতীতে চলে যায়
মাঝে মাঝে চাঁদ কিংবা জ্যোৎস্নাধারা
জানলা দিয়ে বিছানায় এসে মুখ লুকোয়
মনে হয় আমরা সকলেই কতকাল এমনি একসঙ্গে ডুবে মিশে আছি
কতকাল সম্পৃক্ত গভীরে, নিঃশব্দ অথচ
তবে কেন ছুটি চাও—দিবসান্ত দেখে বোঝাই হয়
যোগ্য পথে এক মুখ দেখি না
আমরা ত ছুটির মধ্যেই আছি তবে কেন মন ছুটি চায়।

নিজেকে হারিয়ে

কী একটা হারিয়ে ফেলেছি ঠিক কী যে বলতেই পারছি না
জানলা খুলে ভোরবেলা ভাবলাম আকাশের দিকে চোখ রেখে
কিছুতেই মনে পড়ছে নাকো—কেবল মেঘের মত পেঁজা তুলো
মনের ভিতরে জমছে,
একথা সেকথা জমছে,

দীর্ঘ ত্রাধিবার কাছাকাছি অস্তিত্ব কোথায় ফেলে এসে
এখন কী জন্যে বলো জল মাপছি এই জল প্রশান্তসাগরে
হয়ত হারাই নি কিছুই
রোজ রোজ ঘুম থেকে উঠে আমার কালকের আমি হারিয়ে ফেলেছি
আমি রোজই এক একটি পাপড়ি খুলে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি
রোজ রোজ নিজেকে আমি যে।

তিনি এসেছিলেন

তিনি এসেছিলেন যখন আমরা কেউই ছিলাম না অথবা আমরা ঘুমোচ্ছিলাম
কারণ রাস্তার কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করেছে
দু-চারজন ঘেউয়ের মত ছেলে তাঁর নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজ নিয়েছিল
নিজেই দু-এক গ্লাস জল খেয়ে খালি গ্লাস টেবিলে রেখেছেন
হয়ত বসেওছিলেন কিছুক্ষণ যেহেতু চেয়ারখানা
সরানো এপাশ থেকে ওইপাশে
আমরা নিশ্চিত জানি না কিন্তু বুঝতে পারি
কোন চিঠি দেন নি, কিংবা টেলিগ্রামও করেন নি
পাঠান নি লোকমুখে খবরও একটা, নিজে এসেছিলেন অথচ
তিনি কি গোপন গোয়েন্দার মত দেখতে এসেছিলেন
আমরা কেমনভাবে আছি
তবে কেন বসলেন না খানিক একে একে বলতাম সমস্ত
আমাদের অভাব এবং কত অভিযোগ
না কি তিনি কিংবা অন্য কেউ আসেন নি মোটেই, ফিরেছি আমরাই
মনে মনে মাঝে মাঝে আমরা যারা এখানে থাকি না।

রক্ত জমাট বেঁধে যায়

খুব সহজ হওয়ার জন্যে যখন আমার বাগানে কিছু গোলাপ ফুটিয়েছিল
ভেবেছিল গেট খুলে সোজা চলে আসবে ওরা
টিনের নীচে যেমন খুশি হাত দিলে পেয়ে যাবে চাবি

খুলবে সেলারের তালা শ্রেষ্ঠ মদ যেখানে দিনের পর দিন শ্রেষ্ঠতর হচ্ছে শুধু
কোটের বাটনহোলে গোলাপ লাগিয়ে ওরা হল্লোড় করবে
যখন পুকুরে জলে ব্যাঙেদের ঢেউয়ের সঙ্গীত
যখন পুষ্করপাড়ে বসে বসে কেউ চিঠি লিখবে হয়ত আঁকবে ছবি
যেমন সমস্ত চুল উজাড় করেই সেও
শেষ বিকেলের মরা আলোয় চুল শুকোতো সুখাবহ আলস্যে পায়রাদের মত
ভাবে নি হঠাৎ কোন রাত্রি আসতে পারে
ভাবে নি এত অল্পে সমস্ত ফুরিয়ে যাবে

দুপুরে একঘুমের হাই তুলতে না তুলতেই

দেখবে কি ভীষণভাবে হলুদের পালকের বিষণ্ণতা ঝরে যায়
আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সে কি তবে ঠিকই করেছিল

ছ্যাখো তারও ফেরার সময়…

শ্রেষ্ঠ সেলারের মদ ক্রমশই জমাট কঠিন
আমি ত জানতাম না রক্ত এত জমাট হয়ে যায়

বুকে, বুকের মাঝখানে, হৃৎপিণ্ডের ওপরে।

আমি ও কালপুরুষ

আগুনের জন্যে আমি আগুন হতে চেয়ে শেষবার নক্ষত্রের দিকে তাকালাম
দেখলাম সেও কি শীতল সুদূর।
কলকাতার লাল আকাশ ফেলে রেখে গ্রামে আমি মাঝে মাঝে

কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে যাই

যখন আমার বুকে আগুনের দাহ
নক্ষত্রের মধ্যে আমি ভুলে-যাওয়া নামের তালিকা খুঁজে বেড়াই
দেখতে চাই আধচেনা এক একটি মুখ, কাউকে পাই না।
কিন্তু কালপুরুষ বেল্ট আটকে সতর্ক প্রহরীর মত

দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই।

আমি ঐরকম টান-টান হয়ে এখন দাঁড়াবো

যাতে না সমস্ত দ'হ ঝিমিয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ, আমি এখন…

ভারতবর্ষ, আমি এখন খুব বিশাল করে কিছু একটা ভাবতে চাইছি
আমার মনে পড়ছে লাল চিনারের পাতা জড়ো করছে কাশ্মীরী মেয়েটা
কথাবলার আপেল-ঠোঁট নেড়ে নেড়ে সে বলেছিল
উপত্যকা পরিষ্কার রাখবো আমি
আমাদের বাড়ির সামনে বড় ইঁদারায় যে মেয়েটি গা ধুয়েছে সেদিন
সেও পরিচ্ছন্ন হয়ে চলে গেছে খুব বড় ঘরে
আমার মনে হয় তুমি যেখানেই থাকো
যেখানে যেমনভাবে যারই মধ্যে তুমি থাকো, ভারতবর্ষ,
আমার কাঠের ঘরে, মাটির দাওয়ায়, কো-দের পাতার ঘরে
বাঁশপাতা পাটাতন নৌকোর গলুই কিংবা
পোড়ো প্রাসাদে, শহরে নতুন-জাগা কিস্তি-ফ্ল্যাটে
সমস্ত জায়গায় আমি শুধু একটা ঘর চাই…
তোমার বিশাল ঘরে এখন মশারি ফেলতে হবে
কেন না অনেক মশামাছি দিবারাত্রি ভন্‌ভন্‌ করছে
সেই মশারির ঘর কেমন হবে গঙ্গাবক্ষ-জননী ভারত
তাই ভাবতে ভাবতে শ্মশ্রুসমন্বিত একজন
উইঢিপিতে পরিণত হয়েছিলেন, তিনি কবি তিনি কবি
তাঁর চোখের জলের দাগে যে-পাতাগুলি ভরে গিয়েছিল
তা এক অসম্পূর্ণ ভারতায়ন কাব্য
যার নাগাল সার্কুলার টুরের টিকিটে মেলা ভার
তবু, সেই টিকিটে ফিংফিং-পথে মধ্যরাতে ব্রেকজার্নি করে
প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল শুধু একটা ঘর চাই
আমার যে-ঘর কেবল আমিই বানাতে পারি একা।

চিঠি

মৃত ব্যক্তিদের চিঠি দেখলে চমকে উঠি
আত্মীয় স্বজন বন্ধু যেই হোক, কবি বা প্রেমিক

তারা এত কথা বলেছিল এখন কোথায়
কিছুকাল আগেও ত বিশ্বাস করেছি তারা নক্ষত্রশালায়
ছোট হাসপাতাল থেকে কেউ পাহাড়গুলিতে বড় হাসপাতালে গেছে
কত অনুযোগ, গল্পগুজব এবং হাসিখুশি সেসব
মনে হয় কাল যেন স্তব্ধ হয়ে আছে
কি ভীষণ কথা বলে তারা সব চোখ মেলে আছে
যেখানে জীবিত ওরা আমি ঠিক সেখানেই মৃত
কেন না ওদের মত আমি আর হাসতেও পারি না
তারাই জীবিত, দ্যাখো আমি মৃত, আমি মৃত।

চোরাবালির নীচে

ঘুরে ঘুরে একটাই দিন এক একটা দিনের ভেতরে
চোখেমুখে একরকমের হাওয়া
নিজেই ত নানারকমের জানলা করে নানারকম ঘর গড়া যায়
কোথাও রঙ্গন, চাঁপা, কোথাও গোলাপ, কিন্তু তাও কতক্ষণ?
চোরাবালির বালি এসে ঢেকে দেয় জল, বয়ে যাচ্ছে সেই এক জল
ওপরে কেবল বালি, মাঝে মাঝে তাই সরিয়ে কেউ কেউ জল নিচ্ছে
এবছর ওবছর অনেক বছর।

একজন পুরুষের কবিতা:

১. তুমি কোন ঘরে আছো সাড়াশব্দ নেই আমি এঘর সেঘর করি
কাঠবেরালীর ঐ ফুরুৎ ফুরুৎ সজনে গাছে
শায়ার কোমরের কাছটা এখনো ত ভিজে, শুকোচ্ছে শুকোচ্ছে
তারে মেলে দেওয়া শাড়ি তোমার গন্ধের স্মৃতি ধুয়ে ফেলে
অসহায় কেঁপে উঠছে
আমি সেই কিশোরীকে কাঁপতে দেখেছিলাম ঠিক এরকম এক

দিনে দিনে মধ্যদিনে
তুমি কোন ঘরে আছো কী ভাবে কেমন করে আছো
আমি কি তোমার কাছে যেতে পারি জুতো খুলে সন্তর্পণে নতজানু হয়ে
না কি ঝাঁপিয়ে পড়বো, বলো, শিল্প তুমি ইজিচেয়ারে শয়ান
আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো মধ্যদিনের কাছাকাছি কোন এক কালে।

২. যখন সবাই ঐ লাল বল নিয়ে মাঠে ছোটাছুটি করে
আমি বসে থাকি। ভাল লাগে, ইচ্ছে হয় বসে যাই
স্থিরচিত্র প্রতিযোগিতায় বালকের মত
কেমন সুন্দর ওরা ধাক্কা মারছে, কেমন উচ্ছল ওরা ঐ
জানে না কদিন আয়ু, ধুলো পড়বে সমস্ত শরীরে
এ ওর সামনে গিয়ে কত যেন নালিশ ওদের
রেফারিকে ঘাড়ে করে ওরা সব মাঠের ওপরে
যখন সবাই ঐ লাল বল নিয়ে মাঠে ক্লান্ত হয়ে আসে
তখনো পৃথিবী ঘুরছে, সূর্যাস্তে দিগন্তে লাল গোলা
ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে সবুজ বাগান থেকে নীলিমার নীলে
অন্ধকারে কজনমাত্র বলের চেহারা নিয়ে বিশ্লেষণে রত।

৩. বোমা ফাটাতে বলবেন না আমায়, আমি পারবো না
অহঙ্কার আমায় খুবই সোজা রাখছে
আমার নিজের কিছু গোপনতা আছে যেখানে আমিই শুধু রাজা
রাজার পৌরুষ ছাড়া আর কী চাইবার আছে, বলুন, বলুন
আরো কত লোক আছে শব্দরাশি ঘরময় ছড়িয়ে
তাদের কারুর হাতে ছড়ি, কারো ভিন্ন ভিন্ন বেশবাস
কেউ খুব সাহেবী এবং কেউ খুব স্বদেশী ছিলই
কোথায় গচ্ছিত রাখি সেই সব তারাও আমারই মুখ চেয়ে
এইখানে আছে। যে যতই শিল্প নিয়ে বড়াই করুক
আমি ঐ আলোকরশ্মির পথ ছাড়বো নাকো
বোমাফাটা শেষ হলে জানি মাত্র ছাই-ই পড়ে থাকে
আলোর হারানো রেখা মর্মমূলে চিরকাল, চিরকাল।

৪. সেলিমপুরে একজন সজ্জনকে আমি মরে যেতে দেখেছি
ঢাকুরিয়ায় লাইনে মর, পানাপুকুরে ডুবে মর, কাউকে কাঁদিয়ে মর
খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে চোখের পাতার ওপর পাতাটা নামিয়ে
একজন ভালো লোককে মরে যেতে দেখলাম।
তাতে আর এমন কি—জন্মিলে মরিতে হবে ইত্যাদি
কে বলেছে এমন কি—এখন ত মানুষই মরে, অন্যেরা মরে না
শোনেন নি বিদ্যুৎ-চুল্লীতে লক-আউট
শ্মশানের কাঠ দিয়ে জানলা দরজা বানাচ্ছে অনেকে
পেশাদার শ্মশানযাত্রীরা সব কলম পিষছে
এখন মানুষই শুধু মরে অন্যেরা বসেই থাকে
পরবর্তী, আরো পরে আদমসুমারীর অঙ্কে আয়ু পাবে বলে।

৫. সারা নাচঘরে আমি তাকে এপাশ থেকে ওপাশে যেতে দেখলাম
আমার চোখটা ছিল পাতায়
পদ্মপাতার খালি গায়ে একবার নেয় এ বইটা, একবার দেওয়ায় অ'লো
জুলায়ে সে জল পেতে যায় দূরে, যার পরে জাফরি
জাফরির ওপারে অলিন্দ, তারপর গাছ আর গাছ
সেইখানকার কোকিল যেন কথা করে উঠলো
ঝরে পড়লো দেবদারুর পাতা
আমার চোখ বইয়ের পাতায়, পাতা ভেঙে যায় পাছে
কেন এরা আমার বুকপকেটে গায়ে নিমনিসিন্দু দেয় নি
কেন এরা বলে নি ওকে তাকিয়ো নাকো দূরে
ভালই আছো বইয়ের মধ্যে, ভালই আছো ডুবে—
বললেই বা নিষেধ শোনার জন্যে কী বা প্রতিষেধক আছে
এখন ত আর বয়স মানি না যখন জীবন জানি একটাই
যখন নর্তকী ঐ নিঃশব্দে পা ফেলে পা ফেলে
সময়ের ওপার থেকে নেমে আসে বেলভেডিয়ারে
তার কাছে গিয়ে দেখি গত বছরেও সেই একই সেই একই সেই
যেমন তারও আগের বছর তারো আগে তারো আগে তারো
এবং আমিও সেই আগে ছিলাম, আগে, বছরে বছরে বহু আগে।

৬. ভাল করে জাগবার আগে চুবন্টা ঘুমোব
যেমন খুকখুক কেশে গলা পরিষ্কার করে গায়কগায়িকা
যেমন ইঞ্জেকশনে জ্বর নামিয়ে এন্টিবায়োটিকস দেয় নবীন ডাক্তার
দিন থাকতে থাকতে কাজ সেরে নেয় গ্রামের মানুষ
আমি মাত্র চুবন্টা ঘুমোব আমরা সবাই মাত্র চুবন্টা ঘুমোব
ততক্ষণ কাজ জমুক, পাহাড় জমুক
হাজার ফরমান, তদ্বির, চিঠিপত্র, কাগজের স্তূপ
ঘুম ভাঙলে আমরা সব এক একটা পুরুষ
কালপুরুষের মত বেল্ট এঁটে সদম্ভে দাঁড়াব
যেমন হারকিউলিস ছিল কতদিন আগে।

আমিই তাকে আসতে বলেছিলাম

এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে, কাচের পাল্লা নেড়ে, পর্দা সরিয়ে
কেশে, গলা ঝেড়ে, হাত নেড়ে, পান-জরদার সুগন্ধি ছড়িয়ে
মমতার নীল রিং উড়িয়ে উড়িয়ে ঐ সিগারেট থেকে
সে খুব স্বচ্ছন্দভাবে স্পর্ধা নিয়ে ঢুকতে চেয়েছিল
হয়ত ঢুকেও ছিল, কেন না দারোয়ান সে ত নিদ্রাতুর
কেন না রিসেপশনিস্ট একা একা বানানো কোনো
প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনে রত
সে খুব দম্ভের সঙ্গে হয়ত এসেছিল…
না, কোন চিঠি দেয় নি, ফোন করেনি, নাম ধরে জোরেও ডাকে নি
কেন না যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল তার দেখামাত্র যে কেউ চিনবে,
একডাকে যে কেউ দেবে সাড়া
এবং আমিই তাকে আসতে বলেছিলাম
আমার অনেককালের চেনাজানা
ধুলোপায়ের জগতের আকাশের বইপড়ার মেঘমালার
বর্ষার দিগন্তের ফার্স্ট বয় গুড বয় প্রাইজ এবং
ছুটির ঘন্টার সঙ্গে মেয়ে-স্কুলের পথের প্রেমিক

একা একা বিজনের নির্জনের আলোঅন্ধকারের একজন
দেখলাম এ-ঘর ও-ঘর করছে কিছুতেই পাচ্ছে না আমাকে
হয়ত আয়নার মধ্যে কাচের মধ্যেই সে দেখছিল নিজেকে
চারিদিকে সে-ই সে-ই ধাপ-ধাপে সে-ই সে-ই সে-ই
কী করে আমাকে পাবে আমিই ত বাইরে দাঁড়িয়ে
পর্দাগুলি সরিয়ে সরিয়ে দেখতে চাইছিলাম নিজেকে।

শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে

আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে পারছি না কারণ আর সূর্য নেই
হিমশীতল বরফের ওপর নীল তিমি বেরিয়ে পড়েছে
আমাদের গায়ে এখন ঘন লোম প্রাকৃতিক নিয়মমাফিক
কেউ কেউ দাঁতের ধার কেউ বাহুর মাংসপেশীর
শক্তি কিংবা স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে চিন্তাশীল
এ ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় পাঠাচ্ছি চারিদিকে অন্ধকার রাস্তা
যা দু একটা গাড়ি আছে তাও চালায় অন্ধ চালকেরা
বইগুলি ফরফর করে মেরুপ্রদেশের হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে
ঘুড়ি বলে সেগুলিকে ধরবার কোন বালকও নেই···
অন্ধকার পাহাড়ের ওপর দিয়ে শেষ বার সিলুয়েট
প্রেমের, শিল্পের, মুক্তো অশ্রুজল দশকের, শতাব্দীর
এখনো যে দু একটা মানুষ আছে হয়ত তারাই
চকমকি ঠুকে ঠুকে জ্বালাতে চাইছে সেই আলোর লণ্ঠন।

স্ত্রী

সুইচ টিপতেই ঘরে একরাশ আলো
যেন তোমার চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে দুপুরবেলায়
পর্দা দুলতেই হাওয়ায় ঝলক যেন তোমার খাম ছেঁড়বার কৌতূহল
এদিকে ওদিকে রেডিও বাজতেই যেন তোমার কথাই এঘর ওঘর ঘুরছে
কিন্তু, তুমি কি, তুমি কি ওখানে দূরে দূরে
নাকি পরিণত হলে আমারই দ্বিতীয় স্বভাবে।

শিল্প

লোকের কথার জন্যে কান পেতে রাখি
এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারে কত লোক
যার থেকে মাঝে মাঝে স্পর্শমণি পাই সাজাই আমার ঘরদোর
লোকের মুখ দেখলে আমার সাহস বাড়ে মনে হয় নদীতীরে আছি
ছাড়ছে নৌকো কিংবা জাহাজ, স্টিমার
ওরা শেষবার দেখো হাত কিংবা রুমাল নাড়াবে
আমি তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্জনে ক্রুশোর মত শিল্প গড়ি।

বর্ষাশেষের ভাবনা

আকাশে এখন গমের ক্ষেতের রঙ
অতসীর তাপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে দেখা যায় দূর আমার কত কাছে
যতই এগিয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে পেছনের গাছপাতা হাতের কাছেই
প্রবাসে যাদের চিনতাম তারা কি শুধুই আমার ছুটি কাটাবার ধর্মশালা
অতসী যেমন একদিন বলেছিল— আমি কি কেবলমাত্র
সুখী কৌচ, শুধুমাত্র আসবাবপত্রই
বর্ষা শেষ হয়ে এলে আমার এসব কথা মনে পড়ে যায়
যখন হাওয়ায় ঘুড়ি দরজা জানলা খুলে পৌঁছে যায় তরল রোদের মধ্যে
আমরা কি নিশ্চিতভাবে দূরে যাচ্ছি সরে যাচ্ছি
তট ছেড়ে ধীরে ধীরে জলে ভেসে যাচ্ছে পাটাতন
অতসী, জানো না আমরা ক্রমশই কি নিঃসঙ্গ
যতই পেয়ালা পিরিচ টুংটাং গিটার বাজুক
গম-ক্ষেত আকাশ যেখানে নীল হবে, পুনরপি গমক্ষেত, নীল
সেখানে মায়াবী সেই পিছনের হাতছানি
সম্মুখের বর্বিন্দু প্রিয়জন হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ুক
তুমিও কি সে কথা জানো না
একদিন আমরা এক ধর্মশালাতে ছিলাম।

আশালতা, কবিতার নাম

আশালতা শব্দের পাহাড়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে
সুন্দরী ঝরণার ধারা বুকের ভিতরে বয়ে যায়
গল্‌ফ্‌ কোর্স থেকে ঐ ক্যাডি বালকেরা ছোট বল তুলে আনে
নিয়ে যেতে হবে সেই দূর লক্ষ্যে ঘাস-ঢাকা গভীর গোপনে
আমরা কজন শুধু বাড়ি পালিয়ে পাথরের গায়ে লিখবো নাম
ঘেরা পুকুরের পাশ দিয়ে খোয়ায় বিছানো খাড়া রাস্তায় উঠে যাব
পা থামিয়ে প্যাডল না করে সেই গড়ানে লাগাম ছেড়ে দিই
সাইকেল নেমে যায় সেইখানে যেখানে আকুল আশালতা
সাহেব-বাবের মধ্যে ওতাতত কবরখানার আশেপাশে
পা ছড়িয়ে বসে আছে—সেইখানে শব্দের পাহাড়ে
কুচি কুচি অভিমান গন্ধহীন পাহাড়ী ফুলের নানা রঙ
আশালতা ফুলে ফুলে গন্ধ চেয়েছিল
আমি তার পাশে বসবো, তাকে কি বাঁচাবো
কে যেন এখন ডিনামাইট পুড়িয়ে ভেঙে
টুকরো করবে ব্যাসাল্ট পাথর।

এখন ছুটি চাই

আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম আমার ছুটি চাই
অন্ধকারে আতঙ্কিত দিন গেল
আমার হিসেবের কড়ি ছুঁড়ে ফেলে বেহিসেবী সময় যেন ব থমকে দাঁড়ায়
এক মধ্যাহ্নের পাখি উড়ে যায়
লাল-বেলুন হাতে কেউ বাচ্চা আইসক্রিম খায়
রুমালের কোণে মৃদু গন্ধ পড়ে থাকে
সমস্ত নির্ভার হয়ে থাক ময়দানের ঘাসের বিছানায়
সমস্ত ভারী ভারী প্রাসাদ শুধু বালির ওপরে যেন তাসের নির্মাণ
মনে হয় মুখের ওপর জল-ঝাপটা দিয়ে
স্মরণের কয়লার গুঁড়ো বের হয়ে যাবে চোখ থেকে।

যে কথাটা বলা হল না

শেষ কিছু বলবার থাকে
পেরেকে জামাটা টাঙাতে টাঙাতে যা সহজে বলে ফেলা যেত
আর একটু সাজিয়েগুছিয়ে বললে
হয়ত বা অর্থের বারুদ্রো ঝলসে উঠতো ভেতরের সমস্ত আগুন
কিন্তু বলা হয় না
তার আগে এ ওর দিকে তাকিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসেবনিকেশ করি
বিপক্ষদলের মত দুইদিকে নানা কূট তর্ক জমে যায়
পিনকুশনের মধ্যে কে কত নিপুণভাবে সাজাতে পারবো আলপিন
তারই রেষারেষি
তাই সেই আবহের খোঁজে রোগযন্ত্রণা পেরিয়ে
মনে হচ্ছে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন মমতাবোধ আছে
যে কথাটা বলা হল না সে কথাটাই শেষ কথা ছিল।

আমি ও লাইট রেলওয়ে

যেমন মাঠের ওপর একা একা পড়ে থাকে লাইট রেলওয়ে
রোদ্দুরে কাপড় শুকোতে টান-টান দড়ি কেউ মেলে গিয়েছিল
বেতবনের পাশ দিয়ে ছুটে যায় ট্রেন
উঠে যায় ঘুরে ঘুরে নীলগিরি ওয়েলিংটনে
আমরা কুন্নুর যা'চ্ছ—বলেছিলে তুমি
পলাশের প্রত্যক্ষ আগুন যখন জ্বলে উঠলো ক্ষুদিরামপুরে
আমি ত ভুলি নি ভাল-লাগা, ফিরে যাই সামতাবেড়ে পানিত্রাসে কর্ণাটাকে
কিংবা ট্রামে ধাক্কা খাই গভীর স্বদেশ যখন কানের একান্ত কাছে গুনগুন করে
ঐ রেল দিয়ে মা গিয়েছে কাজললতাটি হাতে নিয়ে,
আজো ওরা লেবকয়ই যায়

আমি শুধু ছুটে বেড়াই হাহাকার কোথাও নেভাতে
যদিও চোখের সামনে দিদি, আমার নিকট বোন কত সহজেই যেন
বুকের ভেতরে চলে যায়,
আমি তার পাশে পাশে একা হেঁটে যাই।

ভারতবর্ষে একদিন

একটা বোতল থেকে বের হয়ে অন্য এক বোতলে গিয়ে ঢুকি
মাঝখানে কেরল-বালিকা সেজে নাচি কোন সার্কাসের দ্বারে
ঝিলিমিলি আমাজন কোন নদী সবচেয়ে বড়ো
ক'র জল ক'চামচ তুলে আনা যায়
মনে হয় মুহূর্তেই ভেঙে ফেলা যায় ঘরবাড়ি
রবিবর্মা, তোমার মালাবার উপকূলের বালিকা এখনো তেমনিই
ঐ শান্ত শাড়িগুলি গভীরেই আন্দোলিত।
নারিকেল-বনের ভিতরে পেটিকোটে জীবন্ত ভারত কথা কয়
আমরা এক বোতল থেকে শুধু অন্য এক বোতলে এখন…
কর্ক মেলে না, কর্ক খুঁজতে চলে যাচ্ছি এ্যাটলাস পাহাড়ে
কিংবা ঐ মৌচাকের মতন একটা সছিদ্র বাক্সে চলে যাই
আমরা কয়েকটা বোতলে কয়েক লক্ষ ভারতবাসী
ম্যাগিনার একোয়েরিয়মে পাশাপাশি আছি
তারই প্রতিরূপ ঘর আপিস কাছারি
সর্বত্র জুয়ার ছড়িয়ে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনবো দড়ি
সূর্যালোকে সমুদ্রের তীরে।

কথা কমে গেছে

কথা বলা কমিয়ে এনেছি এই ভালবাসার ঘরে
এখন প্রেমের কিছু নেই, শব্দগুলি কৃপণ ভাণ্ডারে অবসন্ন

রাতকানা হৃদয় শুধুই দিনমানে কত কিছু করতে চায়
ভিজে কাগজের স্তূপ দড়িতে টাঙিয়ে শেষবার
ঘরগেরস্থালি সব গুছিয়েসুছিয়ে
দিন থাকতে থাকতে আজ বেরোতে হবে
এই কথা ভাবার সঙ্গেই কিন্তু তোমায় কথাই কেন চমকে ওঠে
বাইরে কত কী হয়ে গেল বাইরে কত কী হচ্ছে
খবরের কাগজের পাতায় পাতায়
কথা কমে গেছে ঠিকই, কে থামাবে নীরব কথার সহৃদয়তা।

সেই লোকটাকে খুঁজছি

সেই লোকটাকে খুঁজছি যে আমাকে আগুন জ্বালাতে শিখিয়েছিল
নেভাতে শেখায় নি
এল্উইনের বর্ণিত রমণী যেমন চারটি লোক খুঁজে বেড়ায়
যাদের কেউ না কেউ তাকে এক রোগ দিয়েছিল
মাঝে মাঝে সেই লোকটির গর্জন শুনছি রক্তের ভিতর
আমার চোখের তৃষ্ণায়, বুকের জ্বালায় যন্ত্রণায় তারই দীর্ঘশ্বাস
কোনখানে তারই যেন পরবাস আছে যেখানে সে টেনে নিয়ে যায়
গোপনতা ঝরণার মতন আমার গভীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে আনে
কুয়াশায় পথ হারিয়ে মনে হয় ঐ স্পটলাইট
দেখাচ্ছে আমার অন্ধকার যা শুধু অন্যেরই উত্তরাধিকার
তারই প্ররোচনা আমাকে দিয়েছে ছেড়ে শব্দের বাগানে
যত ইচ্ছে ফল খাও, ফুলের সুবাস নাও বুকে
স্মৃতি নিয়ে খেলা করো, রূপকের প্রতিরূপ গড়ে তোলো
ঝাড়লনের আলো ঝরে পড়ছে নৃত্যশীল পায়ের তলায়
কত যে খারাপ হওয়া যায়—বলেছিল রাজার কুমার
সহস্র সহস্র মুদ্রা যে দিয়েছে মন্দিরনির্মাণে

তবু কি তারাই ছিল বাঞ্ছিত দেবের মনপ্রাণ সাক্ষাতের গুহবাস আরণ্য অন্তর
সেই লোকটাকে খুঁজছি সারাদিন বনে বনে ঘরে বাইরে আমি
তখন বাইরের অদ্ভুত লোক বলে উঠলো
বৃথা চেষ্টা, সে তুমি সে তুমি।…

মানুষ, তোমার দিকে

দেয়ালে পোস্টারগুলি মুছে যাবে এক কিংবা দুটি বর্ষাতেই
মানুষ, তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে আকাশ
পাখিঅলা পাখি বেচতে চলে যায় বাড়িতে বাড়িতে
হরিনাম, মহাকাল কত কথা বলবে রাত্রিদিন
কিন্তু মানুষ নিজেই যদি কথা ভুলে যায়
মানুষ নিজেই যদি প্রেমপত্র ফাঁসে লটকে কবিতাকে ছুটি দেয়
আমি তখনো তোমার দিকে চেয়ে থাকবো
আমার ভিতরে তুমি একান্ত মানুষ।

দরজা দুভাগ করলে

দরজাটাকে দুভাগ করলে এক পাল্লা তোমার আর এক পাল্লা আমার
ছিটকিনি সকলা যেন কে লাগালো চিনি না তাকে
সুইচ টিপলে অন্ধকার খাটের তলায় মুখ লুকোয়
বিছানায় আমরা সবাই মহারাজ আর মহারাণী
কিন্তু হাওয়ায় ও কী ওড়ে, ধরো ধরো,
'প্রাণাধিকেষু আজিকার এ'দিবসখানি রেখেছি সকষ্ট করে বুকে'
যারা লিখেছিল তারা এদেশের সামাজিক ইতিহাসে
কবেকার নায়কনায়িকা, তাদের পায়ের চিহ্ন কেউ কেউ
বাঁধিয়ে রেখেছে ছবি করে

আমরা একমাত্রাই নৌকোর দুজন সওয়ারি সকালে ঝাঁপিয়ে পড়ি জলস্রোতে
তার আগে তালা টেনে টেনে দেখি একবার একজন, অন্যবার আরেকজন
কেন না এক পাল্লা তোমার এবং আর এক পাল্লা আমার।

যখন অন্ধকার

সব পাওয়া হলে অন্ধকার কেন তবু প্রতীক্ষায় থাকে
রাজধানী থেকে সেরা বাউজি কাল উদাস সুরের কোন
একাকিত্ব বাজিয়ে গিয়েছে
ক্ষুধিত পাষাণ থেকে নূপুর ছাদের সিঁড়ি বেয়ে কখনো বা উঠে গেছে ছাদে
কখনো থমকে এসে দাঁড়ালো সে গোল টেবিলের মাঝখানে
এবাড়িতে সান-সেড নেই তাই আলো অনেক গভীরে চলে যায়
বৃষ্টি অল্পতেই আকাশের হাতছানি আনে
এসবের মধ্যে কাকে চিঠি লিখছি, পৌঁছোবে ত
নাকি কোন বুদ্ধিমান সব ডাক ফেলে দেবে ডাস্টবিনে নদীতটে
শীলমোহরছাড়া ঐ রাজমুকুট ধুলোয় লুটোবে…
জানি, অন্ধকার কেশগুচ্ছে এখন বিশ্রাম
এখন বিশ্রাম ঐ সিঁড়ি বেয়ে নীচের ঘরেতে…
অন্ধকার, তুমি এলে কেবল নূপুরগুলি খুলে এসো।

এখন আমরা

এক জানলায় হাত গলিয়ে অন্য জানলার ছিটকিনি খুলে দিই
এক বাড়িতে বই বিছানা কিন্তু অন্য বাড়িতে মন
সমস্ত মিলিয়ে কিছু আলোর প্রার্থনা করি দিনমানে
সমস্ত বুকের মধ্যে জ্যোৎস্নালোকে ধোওয়া গঙ্গাজল
এখন ঘর কিংবা পথ আর পথ কিংবা ঘর একাকার

বর্ষার নদীর জল উঠোনে দাঁড়ায়
ঝিল্লা পোকা চলে আসে শোবার ঘরের দরজায়
আমরা সবাই বেশ ইচ্ছেমতো পথে বাস করি
কেন না ইতিহাস একটা বিরাট জিনিস
পাহাড় থেকে রবিন-চোখে সে দেখছে সবুজ সুন্দর সব গ্রাম
আমরা নিষাদ শুধুই জাল আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি
পাখি ধরবো মাছ ধরবো
এত লাফালাফি সবই পুজোর দালানে ভাঙা মাইকের দারুণ চিৎকার
বাজি পোড়ানোর শব্দ
রাস্তা থেকে কিনে-আনা ধূপ আজ ধোঁয়া দিয়ে ঘিরে রাখছে ঘর ও বাড়ির
সব জানলা খুলে দিলে শুধুই আকাশ আর একখানাই ঘর।

দরজা খুলে দাও

ঘরের বাইরে যেতে গেলে দশটি দরজা খুলতে হয় এর পর ওর পর পরের পর
ততক্ষণ বাইরে আকাশ থমকে থাকে, হাওয়া আর গাছ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে
পাশের বাড়ির মেয়ে ফিক করে হেসে জানলা থেকে সরে যায়
দশ দশটা ঘরে খুব আড্ডায় মশগুল ঐ বড় বড় ছবি
এ ওর হাত ধরে ওরা গোল হয়ে নাচে ফুর্তি করে রাজাউজির মারে
দেখে পিগ্‌মি বাহনেরা সব অনির্দিষ্ট কিছু ভেবে দরজা খোলে দরজা বন্ধ করে
ওদের আড্ডায় যখন হাসির দমকে পিপে খুলে পড়ে যায়
গড়ায় ছড়ায় আর পা পিছলায়
পিগ্‌মিরা তখন চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে শুধু তর্ক আর রেষারেষি করে
সেই হাওয়া আকাশ ও গাছ—এখন বাইরে কেবল তাদের লুটোপুটি
আর শুধু পিপিংটমের মত দূর থেকে দেখা
মল্লিকা, কখন আসবে. এসো একবার
এখন দশ দশটা দরজা হাট করে খুলে রেখে মানুষের মুখ দেখবার।

যখন যেমন কিংবা যে কোন কবিতা

১০ সাদা দিনগুলি ঐ এক একটি খোলা পাতার মতন ফরফর উড়ে যাচ্ছে
জানলা দাও পর্দা ফেলো, সিঁড়িতে কি কাচ্চাবাচ্চা আছে
নিয়ে এসো এইখানে তারা সব কাগজ কুচোবে
এখন তোমাকে পেলে ছাড়ছি না চলো ঐ কাগজের কূলে
কত কিছু সাজাবার আছে—কিন্তু হায় এতদিন পরে…
এতগুলো মেঘমল্লারের গাঢ় আকাশ এবং আকাশভরানো দিনগুলি
মাঝে মাঝে ঝড়ঝাপ্টার চিড় ধরিয়ে দেয়ালে দেয়ালে
দূরে শূন্যে চলে গেছে

এখন শুভ্রতা এত বায়বীয় মনে হয়…
যখন রঙের বন্যা প্রয়োজন ছিল আসো নি তখন
যখন দামাল কোন দাপাদাপি অস্থিরতা মুহুর্মুহুঃ কড়ানাড়া
'শুনতে পাচ্ছো' 'দরজা খোলো' শব্দের কুঠার
কঠিন সেগুন কাঠে আঘাত হেনেছে কোনদিন
তখন কি সে-সবের জবাব মিলেছে ?
আজ সাদা দিনগুলি বেড়ালবাচ্চার মত পাঁচিল টপকিয়ে চলে যায়
অথবা বগলস-আঁটা কুকুরের মত কিছুক্ষণ বাড়ির দরজায় থেকে
ঘাস পাতা শুঁকতে শুঁকতে দূরেই পালায়
এখন কলম কিংবা কাগজ ছাড়িয়ে ঐ পায়ে-হাঁটা শোভাযাত্রা,
যার শব্দ এসে ঘরের ভিতরে লাগে সেগুনাসে, বাঁধানো ছবিতে
এসো তবে ফেনায় উপচে-পড়া ফেটে-পড়া দিনগুলি
আজো বুকের গভীরে তুলে রাখি।

২. আমার পোষাকে সেই ভীমরুল, আমার পোষাকে সেই ভীমরুল
রাজারাজড়ার মত আমাদেরও মনে পড়ে যায়
অথচ সাগরে বাস করে কেন তরে মরি ঐ শিশির-আঘাতে
তুমি বলেছিলে হাত ধরে অন্ধকারে
ভীষণ জ্যোৎস্নায় যখন সবাই গেল বনে
আমরা রইলাম বসে অন্ধকারে পাহাড়তলিতে

আমার পায়ের কাছে জল, তোমার পায়ের নীচে মাটি
মাটি সরে যাচ্ছে মনে করে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে দেখি
গাছ কখন বিবর্ণ মৃত, কুঠারের অপেক্ষায় আছে
কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়—না ঝড়, না বৃষ্টি
বৃথাই জলকাদা করে ঘুরে মরি, যখন যা কিছু যেমন মনে করি
তখন সেসব তেমনই হয়ে যায়
যেমন তোমার নাম বদলে দিয়ে নতুন নতুন নাম রাখতে পারি
যেমন নিজেকে হারিয়ে দূর কোন শৈলাবাসে হোটেলে রাস্তায়
নিজের টুকরোগুলি অতি যত্নে বুকে করে তুলে নিতে পারি
তারপর ফিরে আসতে পারি সারারাত হেঁটে হেঁটে, ঘোড়াটানা কোচে
সমস্ত জীবকলগুলি অনায়াসে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

৩. সহসা আগুনে হাত দিয়ে ছিটকে সরে এসে
পালাও পালাও দূরে ঘুরে ঘুরে অন্ধ বারান্দায়
তখন নারকোলগাছ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসেছে
তখন সূর্যটা যেন নেমে এসে আটকে গেছে তেত্রিশ-বি-এর লাল ছাদে
কিন্তু আগুন কি ছেড়ে দেয় তাকে একবার আগুনের ভাষা যে শুনেছে
অন্ন কিংবা আবহাওয়া থেকে এত আগুন শরীরে সঞ্চারিত
তার থেকে কার মুক্তি আছে
একদিকে পুড়ে যাচ্ছে ফুলঝাড়ি প্লাস্টিক কারখানা
অন্যদিকে লেপ-সপে নেকাৎ বেচারা সারাদিন কে যেন খাটছে নিয়মিত
প্রেম, যে-আগুন জ্বেলেছ একদিন সে-আগুনে ঘর পুড়ে গেলে
আমি রাজপথে তৈরি থাকি বুকে নিয়ে আগুনের বিস্ফোরক বলয়।

৪. কিছু বা আগাছা কিছু যাক-ধরা তেলকুপি লণ্ঠন ইত্যাদি ছিল
বাচাটির গায়ে সারারাত
ফুল ফোটানোর জন্যে কতরকমের সার প্যাকেট প্যাকেট
পাঁজি দেখে ভি-পি-পিতে আনা হল
যেন দীর্ঘ অপচয়িত দিনের পরে একটি কবিতা বিরচিত
যেন কয়েকটা বেলুন ফিরছে দল যাইল ইটা কিছু নয়

কুয়াশার মধ্যস্থান ভেদ করতে স্পটলাইট জেলে দিতে হয়
কিন্তু তারও পরপারে শুধুই কুয়াশা
যার ভেতর মুখাকৃতি আচ্ছাদিত দীর্ঘ কেশদামে
হঠাৎ হাসির তোড়ে সবই ভেঙে গেলে ছিন্নভিন্ন পালকের রাশি
পড়ে থাকে
বুঝি কেউ পাখির হৃদয় উপড়ে টুঁটি চিপে গান শুরু করতে চেয়েছিল
গান সে ত গান কেউ থামাতে পারে না
যেমন বছর বছর সবই মেলাতলা জুড়ে
যেমন গৈরিক ধুলো আশশেওড়ার ঝোপঝাড়ে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে
কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে হাত বাড়ায়, বাসা করে
একদিন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি শুধু ঝুলতে থাকে টিনের লেখায়
আমরা দিকবদল করি
'রাম নাম সত্ হায়' বলে লাল চেলিকাপড়ের শোভাযাত্রা যায়
আমরা লণ্ঠন জেলে সেই মাছটা ধরবো বলে বসে থাকি
যার পেট চিরে সেই আংটি ফিরে পাবো আশা করি
যা পেলেই সব পাওয়া হয়।

৫. আমি কোন মেধাবী রাত্রির শিয়রে দক্ষিণ জানলা খুলে দিলাম
যখন গলির মাথায় ঘাতকেরা নেই, হাল্লা শেষ,
শেষ বেচাকেনা সেরে ফিরে গেল রাস্তার মেয়েটি
এবং চারদিক থেকে ছুটে আসছে ভালবাসার উত্তাপ
উষ্ণতাও পায় অবয়ব, কে বলেছে চাঁদে নেই কোনই উত্তাপ
যখন ইন্দ্রিয়বোধ ব্যক্তিগত···এমন কি শব্দেরও তাপ থাকে
দশতলার ওপর থেকে আবিষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে একা হারমনিয়ম
ঐ রাত্রি দিগ্‌ভ্রষ্ট আমাকে এখন হলুদ রঙের স্থির বিহ্বলতায়
কবিতাকে চিনে নিতে বলে। আমার ঘরের মধ্যে
অস্থির দিনের চলাচলে, ঐ তারে নক্ষত্রবিতানে
দক্ষিণ জানলার ঐ সপ্রাণ বাতাসে
ভেসে যায় অলৌকিক শিল্প-বিভাবরী
ভেসে যায় চারিদিকে রাত্রির কবিতা।

যদিও অলকতন্ত্র

যে দোকানে জর্দা কিনতে যে রাস্তায় বসতো ফুলকন্যা
সেসব এখন কেমন বাউন্ডুলে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে
তাহলে তোমার জন্যে কতটুকু কী বা করতে পারি
জীবনে এক দিক ভরলে অন্য দিক খালি হয়ে যায়
মৃত্যুও পাপোষে দাঁড়িয়ে ঐ যে খলখল হাসছে
মৃত কিংবা মৃতদের ছবি ঝুলে পড়ছে খুলে পড়ছে···
আকাশে আষাঢ় একা ঘোমটাখুঁটির মত আলতো করে হাত বুলিয়ে যায়
এসবের পরপারে চলে গেছে পরম আত্মীয়
মেলায় বসতে না বসতে মেলা ভেঙে যায়
কেবলই 'যাই যাই' করছে চারিদিক
যদিও অলকতন্ত্র যদিও গোলাপতন্ত্র বশংবদ সময়ের কাছে
যদিও 'প্রাণেশ্বর' বলে কেউ ডুকরে উঠবে যাত্রার আসরে
তারই প্রতীক্ষায় আছি যুগ যুগ
অকস্মাৎ তোমার সাক্ষাৎ আমাকে আশায় আশায় রাখে
আমরা সবাই কিন্তু ইতিহাসে চলে গেছি
শুধু ভুলিনি জর্দার কৌটো,
কিনে রেখেছি, যখন খুশি এসে নিয়ে যেও ।

মাধবীবিতানে যদি না থাকে কবিতা

দুচার লাইন কবিতা লিখবো বাস কিংবা ট্রামের টিকিটে
কুচিকুচি কাগজে এবং দোকানের দুমড়োনো ঠোঙায়
হু হু করা দক্ষিণ হাওয়ায় সব উড়িয়ে দেব রাস্তায় অলিতে গলিতে
পরের পর কুড়িতলা আঠাশতলার ফাঁকা হোটেলগুলি থেকে
দু একটা লোক দেখবে
রাস্তায় ঝনাৎ করে বাক্স বাজিয়ে
যাঁরা কালও যেমনি ফ্ল্যাগ দিয়েছিল জামার পকেটে

যেরকম সহজভাবেই টুকরোগুলি হাতে নেবে দু একজন মাত্র দু একজন
অনেকেই ফিরে তাকাবে না।
লড়ঝড়ি বাসগাড়ি যেমন সকালে মাথাগুনতি অফিসের গাড়ি হয়ে যায়
চলে যায় উপেক্ষার কটাক্ষ দেখিয়ে ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো কাউকে
তেমনি ভাসতে থাকবে ফুটবোর্ড, উড়বে টুকরো, বেশবাস, টাক, চুল,
পয়সা, সুপারিশ
কেবল দু একটি ছেলে ঘুড়ি ভাববে, ধরতে ছুটে যাবে লগি নিয়ে
যারা ফুটপাথে শোয়, জলে গাড়ি ঠেলে, ট্যাক্সি ডেকে দেয়
যারা শারীরিক শ্রমে পৃথিবীর মস্তিষ্ককে মাঝে মাঝে হাল্কা করে দেয়
সেই সব ছেলেগুলি কুটিকুটি কাগজ ধরেই বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখবে খানিকক্ষণ
ক্যাথিড্রাল রোডের ওপর যেমন দাঁড়ায় গাড়িমান বিক্ষুব্ধ ছবির সামনে
বলবে নাকো—বুঝিনা কিছুই
শুধু তুলনামূলক বিচারের প্রহসনে আবোলতাবোল বকে
বধির আগের মত মুখভাব করে
ছেলেগুলি সেই সব অভিজাত লোকগুলি বেশ ভাল রপ্ত করেছে বোঝা যায়
কিন্তু মুখবন্ধ হাসিগুলো লাল নীল বেলুনের মত ছুটে বেরোয়
ওদের হাসি কি আর চাপা যায়
ওরা বলবে—থাঃ বাবা, আমরা এর চেয়ে ঢের বেশি কথা জানি
আমরা বাপু ফুটপাথে শুই, চাঁদ দেখি, কত দেখি
বেশ কবছর আমরা এগিয়ে রয়েছি…
মনে হচ্ছে, ওরাই ছিটকে যাচ্ছে কবিতা, কবিতা।

এসো, পাপীয়সী বাঘিনী

খুব সহজেই মিশে যায় গাছ ও আগাছা
বুঝি বা পুণ্যের স্পর্শে পাপ ধুয়ে মুছে যায়
হয়ত পাপও কিছু নেই শুধু লেখায় দিগন্ত খাড়ে করে
কেউ দিগন্তের দিকে মুখ তুলে করজোড়ে প্রার্থনায় রত

কেউ বিপদের ডাক শুনতে পায়···
আমার মনে পড়ে থাকে পাপাচরণের সব প্রতিক্রিয়া দেখবো বলে
একটা গিরিবাজ পায়রা হাত ফসকে ঊর্ধ্বে উঠে ডিগবাজি খায়
কোন কোন আত্মীয়বন্ধু যেমন পাদপীঠ থেকে
মঞ্চের আলোকপ্রাপ্ত নায়কনায়িকা
তেমনি সবই উল্টোপাল্টা চক্রের নিয়মে···
আসলে প্রতিটি মুহূর্তে নবতর সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ জমতে থাকে
নতুন শব্দের রাশি বই ফোটায় ঠোঁটের আগায়···
রঙিন ভাবনাগুলি নানা রূপে এখন উজ্জ্বল
বৃক্ষেরা সকলে পত্রাপাত্র ফুলফলে বিস্তর বদলায় আমরাও বদলাই···
তোমাকে এখন এই আবশ্যক জামাকাপড়ের ভিড়ে
আপিস, ট্রামবাস, টুইশনি, টরেটক্কা, খটখট টাইপরাইটারে
ক্যাজুয়াল লিভ কিংবা কাজে-ফাঁকি টিফিন-সময়ে
দেখি কত নতুনই হয়েছো—
এখন বুকের ওপর আসতে পারো, একদা আগাছা,
আমার বুকের রোমে পাপীয়সী বাঘিনী ঘুমোও।

সোনার সন্ধান করে কাদাখোঁচা

মিহি বাংলাভূমির ওপর কাদাখোঁচা সোনার সন্ধানে
লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যায়
অরণ্যের ছায়াতলে পুকুরপাড়ের ভেজা নরম মাটিতে
গর্বিত বালিকা এক হাঁটে যেন কলেজের করিডরে
আমি উত্তাল রিপুর জন্যে সর্বস্ব সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলাম
কেবই ঊর্ধ্বের দিকে দৃষ্টি মেলে দিতে চায় অস্থির দেবতা
বাগানে চাঁপার হলুদ পলাশের গাঢ় লাল ঠোঁট
আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে
মন্দিরে মিথুনমূর্তি নীচে থাকে ঊর্ধ্বে সুরসুন্দরী সবাই

ইতিহাসে ঘটনা ঘটছে কিন্তু মহাকাল স্থির হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এখন
ছাখো, কি ভীষণ ভাবে পাথরে মুখ থবড়াচ্ছে আমার সময়
জলের নীচের কোন অন্ধকার শ্যাওলার ভিতরে পা আটকায়
এখন সোনার সন্ধানে তারাদের শোভিত আকাশে
উড়ে যাওয়া যেতে পারে মনের বিমানে
সনাতন, দেখে যাও
জঞ্জালেই নখ আঁচড়ায় বসতবাড়ির মুর্গি দিবি৷ চিন্তাহীন।

লিচুতলায় বাংলাদেশ

লিচুতলায় বাস থামতে তুমি দৌড়ে এলে
বাংলার মন্দিরের মত লুক্কায়িত সোনার কলসী তোমার শরীর
আমি তোমার শরীরিণী আত্মাকে একদা নিমনিশিন্দার
ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে দেখেছিলাম
তখন খুবই গোপনতা ছিল গ্রামে…
আমি মন্দিরের সামনে ঘুরে ঘুরে পোড়ামাটি দেখলাম
গায়ের কোট খুলে ব্যাগ-হাতে বিদেশী টুরিস্ট হতে চাইছিলাম
চোরকাঁটার পিন-ফোটা ফুলঝুরি তাপহীন আঁচ লাগায় গায়ে
আধচেনা জগতবিস্ময়ে তুমি এক দৌড়ে কখনো খরগোস
কখনো কাঠবেরালীর চপলতা
আর সেই বাদামী লকেট তোমার বুক থেকে ছুটে এসে
যেন আমার বুকের হাড়ি
পুকুরপাড়ের আলোছায়ায় সুঁড়িপথে হঠাৎ মুখোমুখি
স্থির কোন হলুদ আগুনে আমি ঝলসে গেলাম…
আর আজ এতদিনে লিচুতলায় চিনতে পেরেছো
বাংলার গ্রামগুলি কি উদোম ম্যালেরিয়াহীন
বেহায়া বাউণ্ডুলে রাস্তা দিয়ে বাস যায় রিক্সা হেঁকে যায়

—কে যেন ডেকে উঠলো নাম ধরে কে যেন এগিয়ে দিল ভিজিটিং কার্ড
সুইংডোরের পাশে বসে ঘুমোচ্ছিল বুড়ো দারোয়ান
সে হঠাৎ ভিতর থেকে রাজকীয় পোষাকে বালক হয়ে ফিরে এসে
বিলিয়ার্ড টেবিলের সবুজ মখমলে তার গাল পেতে দেয়
লাঠির ধাক্কায় কিন্তু সাদা সাদা বলগুলি টুপটুপ পড়ে যাচ্ছে গর্তে
আর উঠছে না উঠবে না…

যতটা সম্ভব শুধু ততটাই জল বদলে রাখো।

হাতঘড়ি, হাত ইত্যাদি

হাতঘড়ি না হাত কোনটা চেয়েছি
হাতের প্রদীপশিখা জীবনবীমারও চেয়ে নির্ভরতা আনে
আমি ঐ সূত্র ধরে প্রবেশের অধিকার চাই
আমি যেন সিঁড়িতে তুলতুল যখন সানাই ঝরছে উচ্চকিত আলোকিত ছাদে
সুন্দর দেখেছি কোন টাইপরাইটারে তুলে নিতে ইচ্ছে করে
রবারের দস্তানা পরিয়ে কৃত্রিম অথবা খুবই মানবিক করে তুলতে চাই
কখনো রুমাল রাখলে সুরভিত হাতেরই সুরভি মনে হয়…
হাতঘড়ির সাদা দাঁতে সময়কে বিচূর্ণিত করে
আমি ঐ রক্তমাংসে পৌঁছে গেছি
আমি ঐ বর্ণিল চিন্তায়।

বাড়িফেরার ডাক গাড়ি

ডাকগাড়ি এলে পরে আমার বাড়ি ফেরার সময় হয়
তুমি তখনো ছাদে বসে গান গাও
কতদিন হয়ে গেল ছাদে-শোওয়া বালিশ বিছানা সব এলোমেলো
সহজে গাছের ফাঁকে শীতের ঠাণ্ডা চাঁদ ধীরে অস্ত যায়

সব কিছু বেয়ে যায় বিরাট বিশাল সেই পাহাড়গুলিতে···
আমি অপেক্ষায় থাকতাম ডাকবিলির
কেউ আমায় চিঠি পাঠাবে মনে হত চাঁদের ওপর দিয়ে হাল্কা
মেঘমালিকার মত রাজমুকুটের ছাপ থাকবে, যাবে খুঁজব সেই রাজা
কোথাও আমরা যাব মৃগয়ায়,
কোন পাহাড়ের ধারে গা ভেজাব বর্ষার ঝরণায়—
রাজার ঠিকানা কিন্তু হারিয়েছিল অমাবস্যাতেই···
একদা তেমন কোন গাড়ি তীব্র সিটি তার বাজাতে বাজাতে
দূরগামী হেডলাইট জেলে চলে গেল—
আমি তার ছায়া আঁকতে সুপারিশ হাতে করে
লণ্ঠনে নিবুতি ভেঙে বাড়ি ফিরছি অন্ধকারে
ডেকে হেঁকে কোন অমাবস্যার ভিতরে চন্দ্রবলয়ের উপকূলে।

সবাই বাল্মীকি

একজন সেবাপরায়ণ ঈশ্বরের খোঁজে আমি দু'হপ্তা কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিলাম
জ্বর হলে জলপটি দেবে, কপালে হাত বোলাবে,
খবরের কাগজ পড়ে পড়ে শোনাবে
জানলার পাখি তুলে আকাশ দেখাবে দিনে, রাতে তারা,
তিনশো চল্লিশ মাইল দূর থেকে সুগন্ধ বাতাস নিয়ে আসবে
হৃৎপিণ্ডের কলকব্জা খুলে খুলে মাঝে মাঝে তেলজল দিয়ে
সচল রাখবে এই ঝুমঝুমি ঘড়ি
কখনো ঝুমুরনৃত্যে সাহেবের উঠোনটায় বিদ্যুৎ ফোটাবে ক্যানাফুলে
আর আমি তাকে রকম রকম নাম দেব অষ্টোত্তর শতেরও ঢের বেশি
ছোট্ট বেড়ালের মত কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে খেলা করবো।
কবিতা বোঝাব
যারা প্রলোভন দিয়ে নয়তো অঙ্কুশ বিঁধিয়ে তাকে সচল রাখবো

একটা নিরেট হাতী দ্রুত কলাবাগানের মধ্যে দিয়ে যাবে
একটা দারুণ স্রোত গার্হস্থ্যের কর্মশীল ছোট ছোট নদী
খালবিল হয়ে বইবে গৃহের সম্মুখে
এইসব ঈশ্বর কিন্তু নিত্য আছে
এইসব ঈশ্বর কত চাপ চাপ মাটি দিয়ে গড়ে তোলে বুড়ো বাল্মীকিকে
যখন বাল্মীকি উই-ঢিপি ভেঙে ছুটে যেতে চায় তার
কাঠের একতারাখানা বাজাতে বাজাতে।

রাত্রি কড়া নাড়ে

আমার ঘুমের মধ্যে রাত্রি এসে কড়া নেড়েছিল
আমার দিনের মধ্যে দিন
আমি ছোট্ট কাঠের দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াব
গা থেকে গেঞ্জি খুলে হাওয়ায় সমস্ত বুক
হাট করে মেলে দেব একটা ঝাঁকড়া গাছ
কিছু স্মৃতি অংশত আমার কিছু স্বপ্ন আমারই দেখার
সেই সব বুঝে একা ছাদের ওপর রিমঝিম পদচারণার ক্ষেত্র গড়ে তুলি
এবার বুগেনভিলিয়া পুঁতবো ছোট টবে
পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাসে কাগজের ফুল, আলোকমালার সজ্জা সাজাব ভাবছি
আর অস্বীকার নয়। গেট খোলা। যাব ছড়ি-হাতে বেড়াতে বেড়াতে
বিজিত চাঁদের আলো গোল হয়ে পড়ছে ত পড়ছেই
এখন ঘুমের মধ্যে রাত্রি এসে কড়া নাড়ে
তুমি এসো, তুমিও এখন ফিরে এসো।

আলোর জাহাজ শেষ ট্রাম

বিকেলবেলায় প্রায়ই আলো নিভে আসে
কাটা-তার জোড়ার অভাবে ট্রামের গতির মাঝপথে পৃথিবী থমকে দাঁড়ায়

আমি আর আশালতা

কোনখানে দিনান্ত এখন পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে খাদের শ্রমিক
হল্লা করে বাঘ তাড়ায়…
তখন একটিবার ডাকবাংলো ভাড়া করেছিলাম
বনের ভিতর জ্যোৎস্না ক্যাম্প পড়েছে মাঠের মাঝখানে
আমরা একশো কিংবা দুশো বছর পিছিয়ে থাকলেও কিছু বলার ছিল না…
আশালতা সেই ভরা আলো'র বিদেশে কোন কিছু গোপন করেনি
গোপনতা সামাজিক রাজপথে হেঁটে চলে যায় কিন্তু থাকে না বিদেশে
সবাই এক একটা বাঘ লালনপালন করে মনুষ্যজন্মের কাল থেকে
পাহাড়ের সরীসৃপ আগুনের লাল, রক্ত কৃষ্ণচূড়া জ্বলে
রাস্তার পলাশে কাঁপে সহস্র প্রদীপ
মনে হয়েছিল আমি আর আশালতা চিরকাল ক্যাম্পের ভিতরে
ডাকবাংলোর মাঠে আমরা পাশাপাশি শুয়ে,
বাঘ, বৃক্ষ, বরফেরা একান্ত তখন
আমার ক্যাম্পের বাইরে ওদের পায়ের শব্দ পাড়া মাড়িয়ে যায় চলে যায়
কিংবা চলে আসে সব আমার হৃদয়ে।

শেষবার দেখা হলে

অক্ষিগোলকের মধ্যে কে এখন জয়রাইড চায়
আকাশের ছায়া এসে জমছে ঐ ভুরুর তলায়
এখন বিপদমুক্তি সাইরেন বাজবে বলে
বুকের ভাষায় তারই তরঙ্গায়িত ধ্বনি, গানে অবগাহনের ইচ্ছা…
ইচ্ছা দুর্নিবার বলে দেখা হল মাত্র একবার
যখন হৃদয়ে ছিল পরিপূর্ণ কাজল আষাঢ়…
তখন নদীর কূলে দেখি খেয়াপারাপারে
নয়ত বজরায় চেপে ঊনবিংশশতকের নায়কনায়িকা হয়ে
রক্ত সাবলীল ভেসে যাই,

এখনো সেসব দিন মনে করতে পারছি অবিকল
খোলা জলে অভিজ্ঞ সাঁতার দেয় রুপোলি মাছেরা
দেখা হলে মনে হয় তোমার চোখের মধ্যে তারা
যেখানে 'আকাশ আকাশ' বলে হাত তুলে ঝাঁপ দিয়ে যাই
এখন একবার দেখা হলে জানি দেখা হল শেষবার।

টুপি-খোলা থেকে টুপি পরার সময়

একটা খোলস ছেড়ে আরেকটা খোলসে ঢুকে পড়ি
ভিক্টোরিয়ানের ঐ পদশব্দহীন দিব্যি খাসা স্যাঁৎসেঁতে অন্দর
অভিজাত প্রাসাদ আমাকে গিলে ফেলে
যদিও আমার মধ্যে হাজার হাজার ভাইবোনের
হাজার হাজার চোখ খোলে আগুন ধরায়
আমার নিভৃত খোলস মাঝে মাঝে শক্ত-কাঠ রক্তহীন নিঃস্পন্দ নিষ্প্রাণ ··
কেন তবে চাইছো টিউব কেন চাও চক্রবেড় দেশ
চাপাচাপি হাঁসফাঁস কেন ভাবো দমবন্ধ করে···
ভাবছো সব শাদা বন্ধ পাখিদের খাঁচাগুলি আর দুটি
কাঠি দিয়ে তৈরিও হয় না
এ ওর নিশ্বাস নিয়ে রক্তক্ষয়ী জীবাণুর জটিলতায়
শরীরকেও করা যায় মস্ত রণভূমি,
না কি টিউবের এক কোণে কাগজ-আড়াল গায়ে দিনভর···
প্ল্যাটফর্মে এ ওর মুখের দিকে অবাক-তাকানো···
জীবন পুরোনো হচ্ছে এই রোদে
সমস্ত সম্পর্কগুলি নিতান্ত সহজ পতিত কাঁচা সম্ভ্রমবোধের কোন নিয়মকানুন···
টুপি-খোলা টুপি-পরা মাত্র এইটুকু ব্যবধান জেনে
সাপের খোলস বদলে শীতের হলুদ গাছে আটকে রাখা যায়···
দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, টেলিফোনটা সেরে নিই আগে···
হ্যালো, হ্যালো···কী বললেন

ডাইনোসরগুলো সব ভিজেবেরালের মত রং বদলায় ?...
মিনাকে বলবেন একটু দয়া করে
একপোটা খোলস থাকলে বাদশাবেগমের দেশে লুকোচুরি হাজারদুয়ারি
পাতা-ঝরা গাছের মতই এত সবুজ সতেজ করে তোলে…
আমরা সবাই এখন হয়ে যাচ্ছি প্রাকৃতিক মত ডাইনোসর।

কাগজের বিরুদ্ধে

সারাদিন কাগজ কাগজ খেলা
আপাদমস্তক শুধু কাগজের তুষার ঝরিয়ে সন্ধ্যা আসে…
সবই কি নীরক্ত হয়ে গেল—ফুলগুলি, বুকের নিঃশ্বাস
সব পারিবারিক এখন মাত্র কয়েকটি কাগজ—
এরই পরদার থেকে তোমার ফিনফিনে গলা ভেসে আসে আজো ?
এ শাস্ত্রাগারে আমার চারিদিকে
            সুখ ত জানেই না দুঃখও জানে না ভালমত
যা নিয়ত পাকে পাকে জ্বলছে জ্বালিয়ে যাচ্ছে
            বানানো সিগ্রেট কারো মুখে আগুন দিয়ে…
তবে আর বেশি বেশি কাগজ দিও না আর বেশি আবরণও নয়.
বরং বুকের বার্তা দেয়ালে ইউরিন্যালে
ক্লাবঘরে কমনরুমের মধ্যে সিঁড়িতে ছবি ও ছড়ায়
গ্রাফিটির সাংকেতিক ভাষায়
একজন পুরুষ হয়ে উচ্চকিত করে যাক ঘামপঙ্ক এবং চিৎকার…
চলো ! কে প্রয়াগে চলো রাজা হর্ষবর্ধন এখন
            নিরর্থ অক্ষরগুলি বিলোতে ছড়াতে,
রাজবেশ খুলে পরবো কুটিরশিল্পের কোন মোটা পরিধান।

গোপা গেছে গৃহযুদ্ধে

যেমন জুতোর পেরেক, মনমত কলমও হয় না
হাতে কারুকার্য নেই হা-হুতাশ সময়ের তার
বুকের ওপর চেপে বসে···ধার নেই ক্ষুরে ধার নেই
দুচারবার কামানো ব্লেডও আর ভালভাবে আওয়াজ তোলে না
এবং এক একটা দিন চাই ছড়ার আড্ডাখানায়, মাদুরে, চাইহানে
সবাই যে যার ধান্দায় ঘুরে বেড়ায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল
(গোপা তুমি যশোধরা ছিলে, উপেক্ষিতা তুমিও সেদিন)
আমারও চাহিদা ছিল কত বেশি
কি আশ্চর্য বোধদের ঘষতে ঘষতে সবই উবে যায় ক্ষয়ে যায়
তেমনি সবই ভেঙে যাচ্ছে কাচের বাসন
প্রত্যেকেই পৌঁছে যাচ্ছে সমস্ত প্রশ্নের শেষধাপে
জুতো সেলাইয়ের লোক দেশে চলে গেছে
কলমসারাইয়ের সব দোকানও বন্ধ
এখন ব্লেডের ওপর হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় না
গোপা গেছে গৃহযুদ্ধে
কেবল শূন্যতা জমছে ঠাণ্ডা ঘরে চারিদিকে যে কোন অক্ষরে।

এখন প্রত্যেক ব্যক্তি

কার্পেট বিছোনা দিন পেতে দিয়ে
লাল শালুর 'স্বাগতম' আমন্ত্রণের ফাঁকে লিখে
রাজপথে অভিষেক হবে বলে জানতাম···
দুই পাশে কাতারে কাতারে মস্ত বন্দীয়ান
এখনই অর্কেস্ট্রা, শুরু গার্ড অব অনার···
যে-কোন ব্যক্তিই সম্মানিত হলে পরে পাপাচরণ করতে পারে না কো
এখন প্রত্যেকটি লোক বুকের নৈঃশব্দ্য বুকে নিয়ে
একা একা দাঁড়াবে, এখন তেলেজলে পা ধোবেই দাঁতাল রমণী

ভালবাসা এলে পরে সকলকেই নিজের নিজের মদ দেওয়া যায়
কেটে কেটে দেওয়া যায় তরমুজের লাল লাল ফালি,
কার্পেটের ওপর দিয়ে বয়ে যায় গাঢ় লাল মদ
চারপাশের সুগন্ধ এখন।

শিখরের রাজা হবো

শয্যার ওপরে সব বইগুলি রেখো
ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে যাত্রা সুগম হবে ঠিকই
তা ছাড়া একটা পথ—কুঁজো চাই, রাতের খাবারটাও
ঠেলাগাড়ি থেকে কিংবা নিজেরই সঞ্চয় থেকে কিছু বই
অধুনা বইয়েতে আর নামাঙ্কন যদিও করি না
তবু সে আমারই বই, অপঠিত, আমারই প্রেমের মত অপূর্বদর্শন
রাজপুত রমণীর জহরব্রতের কুণ্ডে ঢেলে দিও
সারি সারি বারবন্দী ভিজেবেরালের মত শাড়ি
একবার পরার জন্যে কাটাবার ফিসেবনিকেশ যেমনি হাসিমুখে
ঠিক সেরকম সব বইগুলি…
এক একটা যুগ কিংবা এক একটা উত্তাল যৌবন
অক্ষরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে ছুটতে ছুটতে ছুটে
আমার মাথার নীচে, চারিদিকে,
প্রেম, তুমি অক্ষরের ইঁটগুলি পর পর রেখো হে সাজিয়ে
মনের গোপনে পিরামিডে।

বিস্ফোরণ শেষ হলে

হাত বাড়ালেই ট্যাক্সি, বন্ধু, এসো, ঘুরে আসি আউট্রাম ঘাটে
জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ওড়ায়…

বুকের স্বস্তির ওপর পাড়কলায় ধবার ধবার আলতো ব্যবহার
সোনা-পায়ে আলতা পরানো ছিল যবে যবে
এখন সেসব এত ভয়ানক লাগে
কেন না এক হাত খালি অন্য হাতে ঘড়ি বা ব্যাগটি
এক হাতে ছেড়ে যাওয়া অন্যহাতে ট্রামের হাতল,
গড়িয়ে বছর দিন চলে যায় ··
পিছু হাঁটলে, হাওড়া ব্রিজের ওপর খালি দাও
খালির কর্কশ পথে মরচে টাকা ঘুরে যায়
শীতের আকাশে গোল পায়রা'র মণ্ডল···
বন্ধু, এক একটা দিন এক একটা ভাঙন
আদুরআড়ার মাটি তুলে কালীপুজোর দিনের পুতুল
পরে পরে রোদে ও আগুনে সেঁকা হয়···
এখন নিভার ওওয়া কান্নার মধ্যেই
এমন মিশেছে একরকম পুরুষালি গন্ধ যেন প্রিয়···
নিশ্বাসের শেষ করে চাঁদ খুলি গাড়ির ভেতর।

সারাদিন বছর বছর

চোখ মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে আছি সারাদিনই
উঠোনে কাপড় মেলে নির্বিবাদে ঘুমোয় মেয়েটা সারা দুপুর
গাছকে পুরুষ ভেবে ভয় করে না···
ডুকরে কেঁদে উঠলে আকাশ চমকে ওঠে বিদ্যুৎ সহসা
এবাড়ি ওবাড়ি জুড়ে সন্ধ্যা নামলে
একটা গিরগিটি কিংবা বহুরূপী ছোট্ট দুটি চোখে
এদিক ওদিক চেয়ে ঢুকে যায় গভীর গহ্বরে চিতোনো বুকের মধ্যে
যে-বুকের ওপর দিয়ে রোম-কাঁপানো ঝড় বয়ে গেল
যে-বুকে এক একটি দিন এক একটি হাতুড়ি···

বিয়েট বলের মত সকৌতুক চোখের নির্মাণ
ভেঙে গেলেও চেয়ে থাকি পাথরের সেবস্তা কোথাও
ভাঙা বুক খুলে রাখি আকাশের মুখোমুখি করে···
সারাদিন বছর বছর দাওয়াতেই দ্বিধাহীন শুয়ে থাকে একলা মেয়েটা।

একজন অভিযাত্রী

এখন চরিত্র শুধু জল বয়ে যায় পোড়-খাওয়া কাঠগুলি
বোতলের ভেতরে ভেতরে ডুবে ডুবে জল খাওয়া
দেশদেশান্তরগামী পত্রাবলী···
হিমানী-পাখিরা আসে ট্রপিক অঞ্চলে যখন চরিত্রে কোন বিবাদ থাকে না
যখন মুহূর্তে বৃহত্তম সবই ভোগ করতে পারি
ঘর-দুয়ারে মাথা-ঠোকা শেষ করে যায়
মনে হয় জানলা খুলে ডাকি এসো এসো সবাই এখন
দোতলা তেতলা কিংবা আরো উঁচু সাততলা থেকে···
রথের সমান উঁচু ড্রেনপাইপ বেয়ে জল নামে জল নামে এখন ঝর্‌ঝর
এসো দড়ি ধরে টানো শূন্য রথ সচ্চরিত্র
এসো চারিত্রিক মালিন্যবিহীন কোন মানভঞ্জনের পালা শোনাব এখন···
এখন রথের চূড়া মস্ত মাস্তুল ঐখানে পাইপ বেয়ে উঠে যাব···
কালো-চামড়া তালগাছে উঠে যাব সকালে বিকেলে।

রাজরাণী ঘুমিয়ে পড়েছে

বুকের ওপর কোন রাজরাণী ঘুমিয়ে পড়েছে
ক্লান্ত সৈনিকের একা রাজধানী আমি জেগে
মধ্যরাতে খেয়াপারাপার বন্ধ···

তাঁর দ্রুতবেগে মেঘের ভিতরে থেকে ধাবমান,
বিকেলবেলার পার্কে সদ্যবালিকাযৌবন কোন বালিকার
শেষ দোল, ঊর্ধ্বে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, নীচে রক্তিম তপস্বী দেশকাল···
আমার বুকের কাছে যোগবিশেষজ্ঞ কাল কান পেতেছিল
বহুকাল বছরে বছরে পর্যন্ত কয়েকটি দুপুর আমি এ-বাকে তুলেছি···
এখন দু-একটা দিন, উৎকেন্দ্রমূলক ট্যাক্সি যায়···
আমার বুকের ওপর রাজধানী ঘুমিয়ে পড়েছে,
আমারই বিষাদ কিংবা আর্দ্রতা নিবিড়
রক্ত পুতুল এক উপহার দিয়েছে আমায়।

দরজাকে জানলা ভাবি

দরজা ছোট করে জানলা বানাই, জানলা বড় করে দরজা
খাও খাও মনের সুখে আমি শুঁকবো গন্ধ জরদা
কোথাও যেতে বোলো না এখন কোথাও যেতে বোলো না
এখনো কই বিকেলবেলার কাজ হল না কাজ হল না
ভাবনা যেমন অন্ধকারটা ঘনিয়ে আসুক ঘরে
কর্পূর মিশ্রণে জমিয়ে-রাখা আচার খাব বুড়ো আঙুলে···
তুমি কানের পাশ দিয়ে এসে জরদা শুঁকিও
মাঝে মাঝে জিভ বার করে লাল হল কিনা দেখো
টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল হলে বল্ টিয়া রামনাম বল্
যে যা বলে বলুক সবাই জানে
শেষ পরীক্ষা হয় সকলের আপন শয্যাতলে
সেইখানে সব বুদ্ধি সব বিবেচনা এক হয়।
বয়স্করা মশারির গায়ে হালকা পরীদের মত ঘুরে যায়
মশারা রক্তের ছিপে অশেষই বুদ্বুদ বয়ম ··
এই নিয়ে ফিরে আসি নিজের শরীর মাঝখানে
দরজাকে জানলা ভাবি জানলাকে দরজা
খাও খাও মনের সুখে বাক্সো জড়ানো জরদা।

অপচয়ের দাবী

ঘর ঝাড়বো না রবিবারে শুয়ে থাকবো
যোগ ছোকরা চড়ুইগুলির সঙ্গে বাড়িভাড়া নিয়ে ঝগড়া করুক
কাবলিঅলা এবং বেড়াল ওঁৎ পেতে থাকুক ওপাশে
পিপিং টমের মত চুপি চুপি হাতটা এগিয়ে এসে ফুলগুলি ছিঁড়ে ফেলছে
চট করে টিনপোকার ছুঁড়ে দেব
ক্ষেতের মালিক তার বমালসমেত ঠিক ধরা পড়ে যা'বে
বই আর খবরের কাগজ ছাইদান চায়ের কাপ লুঙ্গি ও পাৎলুন
দাড়ি না-কামানো, চুল-বড়ো, কিন্তু পড়া হচ্ছে কই শিল্পকলা কই
অপচয় প্রসাধন অপচয় বাড়ির ঝাড়াই
কাজকর্মে মাঝে মাঝে ফাঁকি
শিল্প নিজেও কোন রাজার বিচারে পাতা-ভরানো মস্ত অপচয়।   ১৯৬৮

কলিংবেলে ডাকো

কলিং বেল টিপলে সবাই জেগে উঠবে রাতে
আমি যখন চুনির আংটি পরাব এক হাতে
আমার পাড়ার বাসিন্দারা দ্রুত বাড়িবদল করছে গাড়ি কিনে বাড়ি কিনে
প্রত্যেক জায়গায় কিছু কিছু দেনা রাখছে সবাই
সুখ ভাললাগার দেনা প্রকৃত প্রস্তাবে যা শুধুই বেদনা
যারা জন্মাবধি এই ছবি মাদুলি তাবিজ করে বুকে
ছিন্ন ভিন্ন শকটের খুদকুঁড়ো গাড়ির মাথার চাপায়
সবাই কি চুনির আংটি মনে রাখবে যেখানেই যা'ক
কলিংবেলে ডাক দিলে
মনের ভেতর থেকে চলে আসবে আমার কাছেই।

দু'এক ঘণ্টার জন্যে

বদলে ওঠা দিনগুলি নিয়ে এখন কি বুদ্‌বুদ বানাবো
সবাই এখন জাহাজে নাবিক আর রুটিমাংসখেকো কোন তার্কিক পুরুষ
কেবিনের পাশে কোন মেয়েছেলে নেই
চুলকাটার দোকানে একটা রাজনীতির প্রব্লেম যেখানে মুহূর্তেই সমাধান পায়
কেন না রাজনীতিবিদের মাথা ও গলায় গামছা-বাঁধা
মাঝে মাঝে হাড়িকাঠে ঢোকে
নিতান্ত পুরুষালি সবই
দ্রুত যায় রঙিন ছাতাটি ফুলবাগান রিজার্ভড ট্রাম
দ্রুত কলকল করে ওঠে একপশটা রমণী, তারা ছা'র সিটকে যায়
সেই দিনগুলি নিয়ে বাথরুমে গলা ছেড়ে গানই গাওয়ার
কুটনো-কোটা বঁটির ওপাশে বসিয়ে
ভালমন্দ আবোলতাবোল কিছু শুনে যাব দু এক ঘণ্টা।

নিজের বাইরে

কত ভয়ানক হওয়া যায় কারো কাছে যার ওপর নিজেরও হাত নেই
নিজের ভিতরে অনুপ্রবেশের অধিকার সচরাচর নেইকো কারুর···
পরস্বাপহারক হই বহু কিছু না বুঝেই
যখন বুকের মধ্যে নানারকমের রক্ত চলাচল করে
সমস্ত শরীরখানা নারিকেলপাতার মত থিরথির কাঁপে
একান্ত নিবিষ্ট মনে ফাতনাটার দিকে তাকালেও
পুকুরের মাছ শুধু মাঝবরাবর চলে যায় ফিরেও না দেখে,
এ যাবৎ সবই ত খেলা চিরদিনই হয়ত বা খেলা
কোন কিছুতেই যেন নিজের কোনই হাত নেই।

যখন বৃষ্টি পড়ে

অধিক বৃষ্টিতে আমার ঘুম পায়
কারো কারো মাথা ধরে
জলে ভাসছে কাঠের তক্তাই দেশলাইয়ের কাঠি
আমার বুকের মধ্যে জল জমেছে বলেছে ডাক্তার
ডাক্তার, ডাক্তার তুমি দিবাচর নিশাচর
আমাদের গলিপথ জানো…
গন্ধে ভেসে আসে রান্না মাংস পেঁয়াজ রশুন
যে মেয়েটার গতকাল ছিল মুখচুন
আজ সে পরেছে খুব বড়সড় জামদানী শাড়ি
খুলছে আর পরছে সবই নিজেরই আয়নার সামনে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
এইমাত্র বিপিনবিহারী কাঠ দিয়ে গেল
উনোন জ্বলবে আর গরম জল হবে সারাদিন
তোমায় সর্বস্ব দিতে পারি, বৃষ্টি স'র্বস্ব তোমায়
এখন বৃষ্টির মধ্যে শুধু ঘুম পায়
মালতীকে ডেকে দিও গা টিপবে ঘুমের ভিতরে।

ভাদ্র এসে গেল

আমার বিবিধ শয্যা ভাদ্রের উঠোনে রোদে পোড়ে
আলোয়ান, হাসি, ফুল, কল্পলতা একদিন শুকিয়ে যেতই
না হয় দুদিন আগে গেল…
একলাফে মন পেরোয় মস্ত বড় বাড়ি
ডাকগাড়ি হাওয়াগাড়ি
এক যোজন অতিক্রান্ত হওয়া যায় মুখোস খুললেই
যখন বুকের মধ্যে রোগ থাকে না, ভাবিনা কিছুই…
ফুলোগুলি বদলে বদলে ঐ বারান্দায়

ঝুমঝুমি বাজায় কোন বাঁশবনঝাড়িয়ে
বন থেকে উঠে এসে টিয়ে
সোনার টোপর তার মাথায় পরিয়ে
ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা সব
এখন দরজা খুলে বাইরে বেরোই
তাদের হলুদ রোদে পোড়ে।

কেমন আছো শিশু ফুলে

কেমন আছো সেখানে শিশু ফুলে
দক্ষিণে কি দরজা আছে পশ্চিমে কি জানলা…
খাটের পাশে সাবেককালের আয়না…
ঝুলিয়েছিলে যেমন রঙের টাইখানাকে…
মেরুদেশের ঠাণ্ডা নিয়ে হৃৎপিণ্ড
হঠাৎ যখন থমকে গেছে, থরথরিয়ে
কে যেন যায় বুঝি বা তার যাওয়ায় ছিল
ঝুমঝুমিয়ে ঝমঝমিয়ে মন বাজিয়ে…
বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল কাগজ লেখে
বৃষ্টি হলে অনেক কথাই ঝাপসা হত
হয়নি তা ত…হতোম-প্যাঁচা মুখ গম্ভীর,
খাটের তলায় মাকড়সাদের জালে জালে
জলচৌকির বইগুলোতে ধুলো জমে—
চারিদিকেই জালের দড়ি পাল বেধেছে
সেই পুরনো নৌকোভাসা ছেলেবেলায়,
শিশু কোনো বিকেলবেলার শেষরশ্মি
এই জানলায় হলুদ করে-দেবার আলো,
যখন তোমার টাইখানাকে অবাস্তবের
আলোয় মেলে দিলাম আমি ঐ জানলায়।

একটি ঘোড়ারোগের খেয়ালে

চোখের ওপর হাতের পাখনা মেলে ধরে
লাল রক্ত শিরাউপশিরা দিয়ে বয়ে যায়
বয়ে যায় ভালবাসা বনচর পেখমমেলানো সমস্ত শরীরে
বৃন্ত কিংবা শব্দ সব
কুচকাওয়াজের জন্যে মাঠের নিকটে ঐ প্রস্তুত এখন
ভালবাসা বুকের ভিতর দিকে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কাতর পা-ধরে যায় হাঁক লাগে একটু হেঁটে গেলে
দুঃখের বিছুটি-লাগা মুখচোখ ফুলে ওঠে কেঁপে ওঠে শুধু…
তুমি বুঝি ভালবাসা দেখো নি হাতের পাখনা মেলে ধরে
ক্ষতি নেই,
খালিপায়ে সারাদিন টো-টো করে ঘোরা ঢের ভাল
রাজার মুকুটও ব্যবহারে ম্লান হলে
মন্ত্রী রোজই খোঁজে ঘোড়ারোগ।

ইতিহাসের পথিক

কোথায় বিকট শব্দে হা-হা করে বেজে উঠলো হাসি
পুরনো ঘন্টাটা কেউ টেনে টেনে বাজায় সহরে
মর্চেধরা সহরের চারিদিকে মরা ইঁদুরের গন্ধ
আরশোলারা চায়ের কাপের কিনার এখন চেটে গেছে
দুর্গন্ধ বুকের মধ্যে পুষেছি এতকাল…
এখন বুকের মধ্যে জেগে উঠছে তন্ত্র ঝংকার
এখানে ধুলোর রঙে মনে হয় ফাল্গুনের বসন্তবিদুরী
চমকে উঠছে অভ্রআবিরের হোলিখেলা…
আমি এক একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র পরখ করছি
দূরে বারুদের হুমদাম
সাঁজোয়াবাহিনী কিছু বড় বড় কামানসমেত

আমবাগানে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাসঘাতক কে কে রণে ভঙ্গ দেয়·
শিরস্ত্রাণ, শিরস্ত্রাণ, রাজমুকুট বলে আমি চেঁচিয়ে উঠেছি…
আমায় এক এক তাঁবু রসদ, অস্ত্রের জন্যে বিখ্যাত, এবং
শেষতম তাঁবুগুলি সুসজ্জিত সুগন্ধ হারেম
পচা শহরের মধ্যে এই ইতিহাস কানাকড়ি দামে
বিকোয় যে কোন ছেঁড়া বইয়ের দোকানে…
অভ্র আবিরের লাল গোলাপি সবুজ ঝরে পড়ে
বস্তির মুন্নিলাল এতকাল পরে আজো
রঙ খেলছে পথের ধুলোয়।

কাল একবার শুধু

কাল এক অস্পষ্ট গোলাপি আমায় মাতাল করেছিল
আমি পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম
যেখানে ছেঁড়ার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই
পেঁয়াজের খোসাগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে সব শেষ…
ঝড় থেমে গেলে ভাবি সুরু করা যাবে
চর পড়বে নদীর মাঝখানে
ভূগোলের পাতায় পৃথিবীতে সব পড়ে…
অথচ কোথাও দাঁড়িয়ে নেই প্রেম
কোন বিন্দু ছুঁতে পারি এরকম হওয়া অসম্ভব
শুধু পাপড়ি ছিঁড়ে যাই
ছিঁড়ে যেতে যেতে গন্ধ
অদৃশ্য আলোর আভাটুকু
মাঝে মাঝে মাতাল এবং উথালপাথাল কোলাচল
কাল একবার শুধু স্তব্ধ হয়ে সেকথা ভেবেছি।

অদৃশ্য সারাই

অদৃশ্য সারাই হয় কোটের ভিতরে
নিকুকর্মে সারাদিন কাটে।
বুকের বাঁপাশে কার রক্তক্ষরী রোগে বাদ হল ফুসফুস
গলার কর্কটে কার গান থেমে গেল
তবুও সারাই, তবু পথে যেতে
আমার চটির গায়ে পেরেক ঠোকার জন্যে বসে আছে লোক,
চারিদিকে মাথাব্যথা বলে
একটি উত্তপ্ত ক্রোড় কে কে খুঁজেছিল সব মাথা রাখবার
ভিজেচুলে এমন ভীষণ তীব্র গন্ধ ভরা থাকে
ব্লাউজের পিছনেও তেলের রেখায় কোন ঘাড়ে
কারুরই দরজাতে ঠিক বাতাবী লেবুর ফুল
অত বেশি ফাগুন আনে না।

তুমি কি

তুমি কি মৃত্যুর হাত ধরে
দিয়ে যাবে অক্লান্ত সাঁতার…
হংসের ধ্বনির মধ্যে আকাশেরও উড্ডীন বাসনা…
নীলাকাশ নীলশাড়ি নীল নিদারুণ বিষ
নীলের মমতা বড় আচ্ছাদিত সমুদ্র আহ্বানে—
চিরকাল নীল ভাললাগা

—চিঠিতে ওসব কথা কেন লিখেছিলে সোনামণি
—কেন পোস্টমর্টেমের আগে ছিঁড়েখুঁড়ে দাও নি সকল
—হৃদয়ের পোস্টমর্টেম হয় না সম্ভব
অতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ওদের সকলকে জানো বিমুগ্ধ করেছি

তোমার ছবিতে খুব বড় বড় মালা পড়ে
কে পরে কে পরে সেই মালা
সে ত আমি
ফেলে দিয়ে তুমি শুধু রংগীন বসন উড়ে গেলে।

গুপ্তধন

খাটের তলার বাক্সে আমার মনের কথা আছে
দিদি, তোর গুটিপোকা তুলোর রেশম থেকে
কবে রেশমি প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল…
খুকুমণি, তোমার পুতুলজোড়া ঐখানে এত বেশি ঘুমোয় এখন…
বৌদি, তোমার সমস্ত চিঠি পড়া হয়ে গেলেও কিছুই বুঝিনাকো।
আজ কেউ বাক্স খুললে ঝলমলিয়ে উঠবে বেনারসী
মুর্শিদাবাদের ধোয়া সিল্ক
খাট নড়ে উঠলে কেউ ঘুমঘোরে এপাশওপাশ করে গেলে
খাটের তলার সেই জগতের মনপ্রাণ স্তব্ধ হয়ে যায়…
ওরই নীচে বসে বসে গোপনে জীবন কার প্রস্তুত হয়েছে
থেকে থেকে চোরা ছিদ্রে অন্ধকারে সোনার
পিঁপড়েদের সারি দেখা গেছে সারাদিন··
বাইরে বেরোবার আগে সযত্নরক্ষিত
গুপ্তধন আজো দিতে পারি।

কোন কোন কথায়

কোন কোন কথায় আমি চমকে উঠি…
কোন কোন শব্দের আড়ম্বরতায় আমার ভয় হয়…
কাক যখন চোখ পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে তাকায়
বেড়ালটা নিঃশব্দে চলাফেরা করে সারকুয়ার দিয়ে
তখন নিজেকে এক বিন্দু জেনে রেটে আঁক কষতে সাধ যায়।
আমার প্রেম, দুঃখ, দাহ, পাপ কিছুই থাকবে না কোনখানে

আমিও না…
গাছ থেকে পাড়া ফল বিক্রির সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান
সবুজ পাতার ফাঁকে মিশে
ঝুড়িতে এহাত ওহাত ওয়াগনে সুদৃশ্য দোকানে
তারপর ডেসার্ট টেবিলে মুছে যায়…
আমরা ওরকম হতে চাই অথচ পারি না…
অসম্পূর্ণতার মাঝখানে
কথা ফুরোবার আগেই কখন
নিঃশব্দ কথায় আমরা চমকে উঠি…
বাইরে প্রতীক্ষারত কে বিদেশী কখন হঠাৎ ডেকে নিয়ে যাবে।

শিল্প আলোছায়া

ঝুলছে লণ্ঠন একটা গরুর গাড়ির নীচে হেলেদুলে
কাঁপছে কার বুকের ধুকধুকি
ওগো কে আছো কোথায় শুনে যাও
আমার বুকের এত সংবাদ কোথায় রাখবো বলে দাও
আমরা সব যে যার ভীষণ কোন অসহায় হাঁকে
মাঝে মাঝে চার হাত প্রমাণ উঠে যাই
আমরা আকাশদীপ তুলতে যাই কার্তিকের রাতে
লণ্ঠন তারও ত কত ঊর্ধ্বচারী হতে সাধ যায়
তাকে আকাশ দাও হে দেখো সেও আপনিই পাখি হয়ে যাবে
তাকে সমুদ্র দেখাও দেখো সেও অভিজ্ঞ নাবিক হয়ে যাবে
ধীরে ধীরে হয়ে যাবে একটি জাহাজ
শিল্প কিংবা রাজহংসদের মত খুব নির্বিকার
এখন লণ্ঠন সামনে রেখে এই মাঠ হব পার
লণ্ঠনের পায়ে পায়ে আলোছায়া
অনেক অনেক পথচলা শুধু অন্ধকার…

কালকেউটে মাথা গোঁজে লণ্ঠনের ঐ অন্ধকারে
আমরা হেঁটে যাই
শিল্প ঐ আলোছায়া আমাদের পা-তোলা পা-ফেলা।

অহঙ্কার ভাঙে

বুকে কারুর মুখ রেখেছি বুকের অহঙ্কার
দেখবো বলে যখন দূর পাখি চলে যায়…
ধ্বংস পাহারাদার বরকন্দাজদল
গম্ভীর হতে গিয়েও ধুলো খেলার সামগ্রীই
রইলো বনে পলাশবনে নিচুতলায় দূরে
সেই যেখানে কাপাসডালে প্রজাপতির মেলা
দিনরাত্রি গল্প বলে মহেশ্বরের চেলা
পাখির ভাষা বুকের ভাষা আবেগ ভরে ডাকে…
এত সুখের মধ্যে আমার দুখের কথা কাকে
বলবো আমি এই বিজনে ভেবেছিলাম কবে,
বুকের নদী সুখের নদী ঘর ভাঙলো যদি
যেথায় বুকে মুখ রেখেছি ভাঙছে অহঙ্কার।

টাঁকশালে আমার মাথা

শহরের বুক খুললে নানা প্রণালীর অন্ধকার দেখা যাবে
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে পেঁচা বসে আছে
অনেক বছর। শুধু এডাল-ওডাল করছে দিনরাত
ছুটির দিনের পার্কে অনুনয়বিনয়ে অনেকে
দোলনায় দুলতে দিলে যেমন প্রসন্ন মনে হয়
সারা জন্ম ভালবেসি এবং বাড়ি

বাড়ি আর গৃহশিক্ষকতা
গৃহশিক্ষকতা আর টাঁকশাল,
টাঁকশালে মুদ্রার ওপর নিজের মস্তক মুদ্রণের ঘোর আয়োজন
নিজের নামেই রোজ চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে
ঈশ্বরপ্রসাদপুষ্ট বোধ জাগে···
ডাকপিওন এমন নিঃসঙ্গ লোককে
বস্তা বস্তা চিঠির বাজার এনে দেয় হাট থেকে
মাঠ থেকে সমস্ত আকাশ থেকে
হাওয়া কিন্তু দেয় না কেউই
আমি এই শহরের বুকে ইঁদুরের চলাফেরা নিয়ে
নিজের সঙ্গেই খুব বোঝাপড়া করি···
শহরের বুক খুললে অনেক প্রণালী খুললে যত অন্ধকার তা শুধু আমার
মাথা বিক্রি করে গেছে শহর। এখন আমিই শহর,
টাঁকশালে আমার মাথাই ছাপা হয় রাত্রিদিন।

রক্তাক্ত বাগান

ফুলের স্তবকে হাত দিয়ে বেলা কাটে
নদীতে সাঁতার দেয় অসংখ্য বালিকা
হলদে প্রজাপতি ধরতে পিছু পিছু লতাগুল্মবনে
ছুটে ছুটে সারাদিন যায়, আচমকা মহিষ দেখলে পরে
অভিভাবকের চেয়ে বড় ভয়ঙ্কর মনে হয়···
ফুলের ব্যবসা খুব ভাল চলে
চাষের আনন্দ, পয়সা, বাগানবাড়ির গন্ধ,
অ্যালিমারি একপাশে, রৌদ্র জল প্রয়োজনমত,
প্রেমের জায়গায় আর অভাব থাকে না কোনখানে···
প্রাসাদে ঈশ্বর এসে মুখোমুখি দাঁড়াবেন
বড় বন্ধুজন তিনি, একা বাউলের একতারা—

বাদুড় ধরবো বলে গাছে গাছে জালের বিস্তার
ঈশ্বরের পাখি ধরবো বলে আমি সংচাষীপাড়া থেকে এই
মর্তটির সীমান্ত অবধি ভালবাসা বিস্তৃত করেছি
বার বার প্রেমে ফিরে যাই, ভাঙি, মরি
লাঞ্ছনার ধুলো থেকে বার বার পা বাড়ি পা বাড়ি
বুকের লাগানো ফুল ফুঁ দিয়ে ধুলোর থেকে ঝেড়ে
কখনো বা জলে ধুয়ে মনের বাগান ভাল রাখি ;
কেউ কোনখানে নেই
ব্যাঙ্ক পোস্টাপিস নেই, ডাকবাক্স ভেঙেছি সকলই,
আমার ঈশ্বর আর আমি
আমি আর ভালবাসা
ফুলের বাগানে আজ একাকী দুজনে ।

কাকাতুয়া, ঘড়ি এবং প্রেম

কতবার ঘড়ি দেখছো···এ্যালার্ম ঘড়িতে কাল থেকে
একটি কাকাতুয়া আমি পুষেছি সজীব,
মাঝরাতে চিঠি লিখতে হবে শেষ চিঠি
প্রেমের অধ্যায়শেষে···নিজের সঙ্গেও হবে শেষ বোঝাপড়া
নিরুদ্দেশ পাখির ভূমিকা নিয়ে যেমন চড়ুই
হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘাতকের হাতে অনায়াসে
আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধাও করে না
প্রায় সেরকম···কিন্তু আগে
ট্রেনের সময়ে শেষ ঘন্টা শুনে দৌড়ে ছুটে গিয়ে
একটি হ্যান্ডেল ধরে প্রেমকে নিয়তি বলে মেনে
সপ্তাহান্তে চলে গেছি সুধার্বের আত্মীয়ের বাড়ি—
আজ সকলের সঙ্গে আছি···
কেন বন্ধু বহুকাল বিয়ে করনি বলে বাংলাদেশে
ঘড়ি কেনা হয়নি তোমার ;

তোমার কণ্ঠেই রাখবো প্রেমের এ্যালার্ম ঘড়িখানি
কথা বলবে কাকাতুয়া
প্রচুর বৃত্তান্ত বলবে বিশ্বস্ত কুকুর
ঘরের মেঝেতে শুঁকে দু পা ধরে প্রচুর যত্নের
মৃতদেহ তুলে আনবে
পূতিগন্ধ ঢেকে দিতে সস্তা এসেন্সের শিশি
মেঝে গড়াগড়ি
প্রিয়তম ঘড়ি যেন পাঞ্জাবির ছোট্ট পকেটের
গুহা থেকে কৌতূহলী হাসি নিয়ে বেরোবে এখন
যেন পকেটের পাশে খেলনার গোলাপে—
আবার এ্যালার্মে সব ভীত ত্রস্ত পথচারীরাও
শেষবার বোবা বনে উচ্চনাদে দেবে করতালি,
খাঁচা ভেঙে উড়ে চলে যাবে কাকাতুয়া
কাচে প্রেম বুঝি মুখাবয়ব ভাসাবে
সময় দাঁড়াবে থমকে
দুটি কাঁটা প্রেমের আকারে যুগ্মতায়
মধ্যযামিনীতে যুক্ত হবে—
তখন চিঠিতে অশ্রু ঝাপসা করে দিলেও অক্ষর
কিছু কথা হবে অর্থবহ।

সবাই বিব্রত

টাই ছিল অনেক রঙের। লাল বোম্বাই বাক্সের
ভিতরে ক্লাপবলিন! অত্যন্ত কাশির শব্দ মাঝরাতে হয়…
দিদিমার গল্পগুলি মাঠের ভিতরে শাদা কাকতাড়ুয়ার
এলোমেলো হাতপায়ে একভাবে স্থির। স্কুলের রাত্রির আলো সদর দরজায়…
খিড়কির দরজায় সব কেনাবেচা প্রতিটি রাস্তায়। ছিল চারিদিকে ভয়।
মিত্তিরবাড়ির মেয়ে চিঠি দিয়েছিল,—পড়া শেষ না হতেই এত বেশি পাকা…
সহজ যাদের কাছে দারুণ বিস্ময় কিংবা গোলাপী সোনালী…

মিত্তিরবাড়ির মেয়ে জমিজিরাতের সব আদর্শ পুরনো,
পুকুর, মাছের বাবসা, কোঠাবাড়ি, গ্রামের পত্তিতি
স্কুলে গিয়ে চিঠি দিয়েছিল, বাবা বিগড়েছিল তার।
যে কেউ বক্ষের থেকে সরে যায় দুঃখ তার বোঝেনি সরমা,
যে কেউ বক্ষের থেকে সরে পরে হাউ হাউ কাঁদে।
মিত্তিরবাড়ির দড়ি মাঝরাতে চন্দ্রালোকে উঁচু ডাল ধরে
দোলনা ঝুলিয়েছিল দু পাঁচিল জুড়ে,
হয়ত স্কিপিংও ছিল, টাগ-অফ-ওয়ার আধুনিকতম···
তবু দুলেছিল দেহ নিষ্প্রাণ দড়িতে।
আমার ক্ষতের 'পরে নীরক্ত নিভৃত গোলাকার
কে ছড়াবে আরো ন্যাপথলিন।

এখন মধ্যাহ্নে

এখন মধ্যাহ্নে আমি পুড়ে গেছি···
জামা খুলে হাওয়া লাগাবার কোন বাতায়ন খুঁজি,
যাঁরা কি আমার পাশে শোবে, যাঁরা বাতায়ন ছিল
আমার খেয়াল-খুশি কাগজের নৌকো ভাসাবার বারবীর জলে।
আজ ডাকবাংলোর কোন প্রতিশ্রুতি নেই···
তোমার অনেক হাঁটতে হতে পারে, ছেলেবেলা স্কিপিং করেছো,
শিরোপা পেরপাদলে পেয়ে নাকি শূন্যের উপরে
আরক্ত বিশ্বাস কিছু রেখে গেছ মন্দিরে তোমার
বছরে একবার যার দরজা খোলা হয়—
ট্রেনের যাত্রার মধ্যে তোমার কী ছিল অভিপ্রায়
সমস্ত পিছনে যাওয়া সামনের এগিয়ে চলাগুলি স্বপ্নে ও স্মৃতিতে একাকার,
সমস্ত মধ্যাহ্ন এক কাঠির ওপর বোধ গঙ্গাফড়িঙের
থিরথির থিরথির পাখনা কাঁপিয়ে হাজার রেখা দীর্ঘ করে যায়
স্বপ্নে ও স্মৃতিতে পুড়ে আমি সেরকম দীর্ঘ হই···

একটি সোনালী চুল পুড়ে গেল
একটি ধূপের রেখা মন্দিরে কখন বন্ধ দরোজায় মৃদু করাঘাত করে
অনেক প্রত্যাশা ছিল বুকে
কারো মুখ চেয়ে আমি সেই সব প্রত্যাশাগুলিকে কমবেশি করিনি কখনো…
মধ্যাহ্নে এখন কোন স্নান নেই, ভীষণ রৌদ্রের তাপে পুড়ি
বিছানায় এখন মাদুর, মীরা বিছানা সাজাবে।

জোড়া পায়রা

কাপড়ের মধ্যে দুটি বাঁধা পায়রা যদি নড়ে চড়ে
ভীষণ আনন্দ লাগে এক জায়গায়
বিচ্ছিন্ন আনন্দ-স্বাদ বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পৃথক
আঙুলে কি চুলে ঠোঁটে আরো নিম্নদেশে…
আফিম দোকানে নেই বলে দুটি পায়রা এখন কী খায় কী খাবে এই ভেবে
সারা পাড়া মাথায় করবো ঠিক সারাদিন.
যারা ট্যাক্সি ডেকে আনে জলে গাড়ি নৌকো হয়ে গেলে গাড়ি ঠেলে
—হঠাৎ আকাশ থেকে ঝরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ—
ঈশ্বরই ত মা-বাপ যাদের সেই সব ছেলেদের নিয়ে
শোভাযাত্রা করবো ভাবি এই বলে 'আফিম আফিম কই প্রভু,
পায়রা কী খাবে বলো পোষা বাঁধা পায়রা দুটিতে'…
পোষা পায়রা আরো কত কখন বিজনে চলে গেছে।
বর্ষার গম্ভীর রাত্রি বরাক্ষলে একটি পালক নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে যায়
আমি পালকে তখন নাকমুখ ছোঁয়াতে পারি নি…
এখন বর্ষার মানে রক্তের ভিতরে মন্দতেজ
রক্তাবশিষ্টের কোন গোধূমধান্যের পাকা ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ নেই।
এখন কেবলমাত্র নড়াচড়া দেখে মনে হয় পায়রা দুটি পোষ মেনে গেছে —
চোরা চালানের কোন আফিম-ব্যাপারী আছে না নেইক' বুকে খুঁজি…
জানো মনোরমা, আমি আফিম না পেলে ঐ পায়রা দুটিকে
মধ্যরাতে নিষ্পিষ্ট করবো এই দৃঢ় দুই হাতে।

পঁয়ত্রিশের আগে

নরম পানীয়ে মুখ, মুখচ্ছবি পানপাত্র থেকে
বিষাক্ত স্মৃতির ভয়ে তুলে নিলে টেবিলের চারপাশের স্বজন
থেমে যায়। নীচে বেড়ালটা অনেকক্ষণ শাড়িটির প্রান্তটি কামড়ায়।
বেড়াল তপস্বী ছিল কোনদিন। উচিত সে লাল পেন্সিলের
ছবি আঁকা হবে বলেছিল কেউ, কারণ সৃষ্টির দাবী
বস্তুত শিল্পেরই দাবী—লাল পেন্সিলের দাবী—
সোনার মতন সব দিনগুলি রোজ চলে যায়, তোমার পানীয়ে মুখ রাখা হয়না
শিল্প নিদর্শক যদিও, ভয়ানক প্রস্তাবনা বাস্তবিক শিল্পেরই প্রকার।
বেড়ালটা রেগে ওঠে—পায়ের তলায় কিংবা উর্ধ্বদিকে
বল দেখলে ভয়ানক ক্ষেপে যায় রোজ
আমি অন্তর্গমনের কথা ভাবি সকালবেলায়
পাশবালিশে দু পা তুলে ঘুমোই যখন—
পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হলেই যে কেউ আর একবার পুরুষের ওষ্ঠগুলি পায়—
পিছনের সব মুখ দূরকায়, কুঁড়িগুলি শুধু শুষ্ক ফুল…
অজগর মতন আমি উরুবিদারণ করে
আমার শক্তিকে বক্ষে জড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারি।
কপালের বেড়ালের মত যে বেড়াল বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল তার সময় হয়েছে
নরম পানীয়ে মুখ, তার মুখ লোভনীয় আজ।

তোমার ফুলদানি

তোমার ফুলদানি দুটি দেবে কি আমাকে?
এখন বসন্ত চলে যায়…
এখন ছুটির পরে যেমন অতৃপ্ত কিছু থাকে
বার হলে নিভৃত স্মৃতির বাসনা চন্দ্রাটির ওষ্ঠ
বারে বারে মুছতে হয়,

নিষ্পেষণে সমস্ত ফুলেরও কিছু রস থেকে গেল বোধ হয়···
শেষ ভূমিকায় টান অন্তের জন্যেই
দেওয়া হয় না দেওয়া হয় না মনে হলে
যেমন সমস্তক্ষণ জ্বালা সমস্ত প্রণালী ভরে জ্বালা
জুতোর কাঁকর কোন সুমসৃণ ক্রোড়ে
আমি সেরকম ভেবে মাত্র দুটি ফুলদানি চাই
তোমার ফুলদানি দুটি দেবে কি আমাকে ?
যখন বিক্ষোভ কোন ছোটসাহেবের পাড়া থেকে ভেসে আসে
রাস্তায় ভীষণ হল্লা, যানবাহন নেই,
সমস্ত কনুইগুলি উদ্ধত সঙিন
সুখী নাগরিক যদি চেয়ে বসে—দেবে ফুলদানি,
দেবে না তবে কি ?
জানলা খুলে দেখতে পাবে ভোরের বাগানে
টুকরো টুকরো কাচ হয়ে গেছে ফুলদানি ।

জীবন পুরুষের নাম

বড় বৌদি কাল চলে গেছে
ছোট বৌদি চুল খুলে বন্ধুকে বেড়ায় খোলা মাঠে
বুনো ফলে এমন তিক্ততা যাতে খেলে মাথাধরা সেরে যায়
পথের ওপর যারা জড়িবুটি হাড়গোড় বেচে তাদের হাড়ের
দুন্দুভি শোনাবে বলেছিল কালো চিল
    য তা শুনিনি ভয়ে ! এত ভয় লাগে
সারা বাড়ি একা একা···
জানলার পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে দিন সরে গেলে
মনে হয় জীবনই এগোলো,
জীবন টুইসনি সেরে এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে···
মাধবী অনেক বড়লোক ওর কি পছন্দ হবে সামান্য জীবন···

আমি ও জানলার ধারে কতদিন আছি
রোজ রোজ ওকে দেখি···
বড়বৌদি অনেক দেখেছে
ছোটবৌদি আরো কিছু জানে
জীবন আমার কাছে পুরুষের নাম।

আমায় বলে নি

গন্ধতেল ফুরিয়ে যাওয়ার আগে
আমায় বলে নি কেন কেউ,
অন্দরের পর্দা নাচে হাওয়া'র ভিতরে
ওপাশের কৃষ্ণ গাছে পাখিদের বাসা
স্মরণাতীতের স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে—
আমি কোন বৃক্ষে যেন গা ঘষেছি হরিণের মত
চন্দনের গন্ধ নিতে
কিছুই মানি না বলতে ভয়ানক প্রিয়তর লাগে
কেন তবু বুকের ভিতরে মুখ মনে এলে রোমাঞ্চপিপাসা
কণ্ঠ নাড়ে, হাত বাড়ায় সুদূর অবধি
সেই সব ভেবে এই রাত্রি জেলে দিয়ে
সমানে মোমের গন্ধে গভীর স্পর্শের মধ্যে একা
অনন্ত উত্তাপ খুঁজে পাই···
গন্ধতেল মাথা থেকে আচ্ছন্ন আবেশে
করে এক প্রাচীন রচনা···
কিন্তু তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগে
আমায় বলে নি কেন কেউ
আমায় বলে নি।